দাম : দশ টাকা

সীতারাম ইয়েচুরিদের
ধিক্কার প্রাপ্য
—পৃঃ ১২

স্বস্তিকা

ইসলামী মোল্লাতন্ত্রের
বিরুদ্ধে তারেক ফতেহ্‌র
লড়াই —পৃঃ ৩১

৬৯ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ১৩ মার্চ ২০১৭।। ২৯ ফাল্গুন - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

সমাজ সংস্কারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের
আবির্ভাব : শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী
পৃঃ - ১৭

চৈতন্যদেবের সংগঠনশৈলী
আজও আদর্শ : ড. সীতানাথ গোস্বামী
পৃঃ - ১৪

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ২৯ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১৩ মার্চ - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

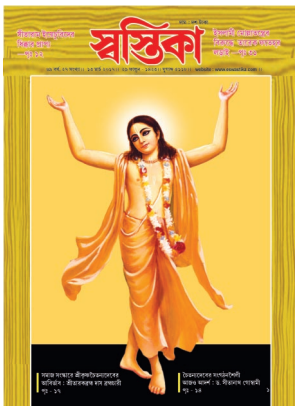

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

সমীক্ষা বলছে উত্তরপ্রদেশ এবার বিজেপির ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : আমার বুকে দিদির ছবি, কী করে যে মুছি! ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

সীতারাম ইয়েচুরিদের ধিক্কার প্রাপ্য ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১২

চৈতন্যদেবের সংগঠনশৈলী আজও আদর্শ ▯ ড. সীতানাথ গোস্বামী ▯ ১৪

সমাজ সংস্কারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ▯ শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী ▯ ১৭

জল নিয়ে সংঘাত ▯ গোপীনাথ দে ▯ ২০

পূর্ণচন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ▯ রসিক গৌরাঙ্গ দাস ▯ ২১

তামিলনাড়ুর একটি প্রাচীন পরম্পরা জল্লিকট্টু ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ২২

স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফল বলে দিচ্ছে বিজেপিই ভারতের প্রধান জাতীয় দল ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৭

অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পগুলিতে ক্রমশ বাড়ছে হিন্দুর সংখ্যা ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ২৯

ইসলামি মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারেক ফতেহ্‌র লড়াই ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বাংলা ভাষার ইসলামিকরণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি শিক্ষা— সাহিত্য ও ভাষায় ইসলামি ধ্যান-ধারণা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে যা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে পঙ্গু করে দেবে। এই বিষয় নিয়েই আগামী সংখ্যায় লিখছেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রবাল চক্রবর্তী, অমিতাভ সেন প্রমুখ।

নববর্ষ সংখ্যা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর ভবিষ্যৎ

আগামী ১৭ এপ্রিল প্রকাশিত হবে

মূল্য একই থাকছে— ১০ টাকা

সত্বর কপি বুক করুন

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

আধার কার্ড লইয়া রাজনীতি

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিল কার্ড বাধ্যতামূলক করিবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার বক্তব্য—কেন্দ্র সরকারের এই সিদ্ধান্তে গরিব, খাটিয়া খাওয়া মানুষ এমনকী শিশুদের পর্যন্ত বঞ্চিত করা হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশকে অগ্রাহ্য করিয়া বিনা পরিচয়পত্রেই শিশুদের মিড ডে মিল দেওয়ার পক্ষে তিনি সওয়াল করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই কলকাতায় মিছিল করিয়াছে। সেই মিছিলে তৃণমূলের বরিষ্ঠ নেতারা ও দলের বহু কর্মীও উপস্থিত ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ডেরেক ও'ব্রায়ান বলিয়াছেন, বিষয়টি তিনি সংসদেও পেশ করিবেন। রাজ্যসভায় বিষয়টি লইয়া আলোচনার দাবি জানাইবেন। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র বিরোধিতার নীতি এখনও চলিতেছে। ইতিপূর্বে কেন্দ্রের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হইয়াছিলেন। নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত কেন্দ্র সরকার যাহাতে প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয় তাহার জন্য তিনি দেশব্যাপী আন্দোলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত সেই আন্দোলনে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায় নাই। নোট বাতিলের সিদ্ধান্তও প্রত্যাহৃত হয় নাই।

কিন্তু তাহা হইলে কী হইবে, মোদী বিরোধিতার প্রধান মুখ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা তিনি অব্যাহত রাখিয়াছেন। ইহার অবশ্য রাজনৈতিক কারণ রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্য-রাজনীতিতে বিরোধী দলগুলি তেমন প্রবল প্রতিপক্ষ নহে। কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল হইলে কী হইবে, কার্যত এই দলটি এখন সাইন বোর্ড-সর্বস্ব। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের ছয়জন বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে বামপন্থীরা যে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। রাজ্য-রাজনীতিতে এই দুই দল মমতার কাছে তাই গুরুত্বহীন। অন্যদিকে বিজেপি বাংলার মাটিতে যেভাবে নিজেদের ভিত ক্রমশ দৃঢ় করিতেছে, তাহাতে মমতার যথেষ্ট আশঙ্কিত হইবার কারণ আছে। তাই বিজেপি বিরোধিতাই এখন মমতার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রকৃত ঘটনা হইল রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি, একশো দিনের কাজ, প্রবীণ নাগরিকদের ট্রেন ভাড়ায় ছাড়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে মিড-ডে মিল-সহ প্রায় ৩৪টি সরকারি প্রকল্পে সুবিধা পাইতে ইতিমধ্যেই আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু তাহাই নয়, ওই তালিকায় আরও ৫০টি প্রকল্প সংযোজন করা হইবে এবং মিড-ডে মিল-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের সব ভর্তুকি প্রকল্পে আধার কার্ড ১ জুলাই হইতে বাধ্যতামূলক হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভর্তুকির টাকা বেহাত হওয়া বন্ধ করিতে আধারের মাধ্যমে ভর্তুকির টাকা সরাসরি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে পৌঁছাইয়া দেওয়ার পরিকল্পনা প্রথমে করিয়াছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন পূর্বতন ইউপিএ সরকার। খোদ কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পর্যন্ত ভর্তুকির টাকা বেহাত হওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসিয়া বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ওই আধারকেই যাবতীয় ভর্তুকি প্রকল্পে বাধ্যতামূলক করিতে চায়। ৩০ জুন পর্যন্ত আধার কার্ড তৈরি করিবার সময় রহিয়াছে। সেই সময়ের মধ্যে তাহা না করিয়া আধার কার্ডের বিরোধিতায় রাস্তায় নামিয়া আন্দোলন করিবার কোনো যৌক্তিকতা নাই। সঙ্কীর্ণ রাজনীতি ব্যতীত ইহাকে আর কিছু বলা যায় না।

সুভাষিতম্

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
নাসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্বসায়তনং ত্যজেৎ।। (মহাভারত)

বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক পা এগিয়ে অন্য পায়ে ভর দিয়ে দ্বিতীয় পা বাড়ায়। পরবর্তী স্থানটি না দেখে পূর্ববর্তী স্থানটি ছাড়া উচিত নয়।

প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরও এক ধাপ

স্মার্ট শহর রূপায়ণে এগিয়ে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় স্মার্ট শহর মিশন প্রকল্পের বাস্তবায়নে এনডিএ শাসিত শহরগুলিই এখনও পর্যন্ত সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে বলে এক তথ্যে প্রকাশ। সামনের জুনে এই প্রকল্প রূপায়ণের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে তার নব্বই শতাংশ পূরণ (ইনভেস্টমেন্ট কনভারশান রেশিও ৯০ শতাংশ) করতে পেরেছে বিজেপি তথা এনডিএ শাসিত পাঁচটি শহর—নাগপুর, ইন্দোর, সুরাট, ভদোদরা ও উদয়পুর। ইনভেস্টমেন্ট কনভারশান রেশিও বা আই সি আর অনুযায়ী নয়া দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (এন ডি এম সি) তার বরাদ্দ ১৮৯৭ কোটি টাকার মধ্যে খরচ করতে পেরেছে মাত্র ৩৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের সূত্র অনুযায়ী মন্ত্রক এখনও পর্যন্ত দেশের ষাটটি শহরকে কেন্দ্রীয় স্মার্ট শহর মিশন প্রকল্পের অন্তর্গত করেছে। এর মধ্যে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে দেশের ২০টি শহর স্মার্ট সিটি মিশনে তাদের অংশগ্রহণের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিল। যার মধ্যে ইন্দোর, সুরাট ও উদয়পুরের মতো শহরগুলি ছিল। গত বছর মে-তে তেরোটি এবং সেপ্টেম্বরে আরও সাতাশটি শহর ওই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অন্তর্গত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার সেপ্টেম্বরে যে সাতাশটি শহর এই প্রকল্পের আওতায় আসে তার মধ্যে নাগপুর ও ভদোদরাও ছিল। কিন্তু মাত্র কয়েকমাসে তারা স্মার্ট শহর প্রকল্পের বাস্তবায়নে যে অকল্পনীয় উদ্যম নিয়েছে তাতে ওই শহরদু'টি এ ব্যাপারে প্রথম পাঁচে চলে আসতে পেরেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নাগপুরের কথা। তারা রেকর্ড গড়ে আই সি আর-এর ২৪৯ শতাংশ ছুঁতে পেরেছে বলে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্যে প্রকাশ।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পটি পুরোদস্তুর পরিকল্পনা মাফিক বিনিয়োগের ওপর দাঁড়িয়ে। সুতরাং প্রশাসন যেখানে যত বেশি স্বচ্ছ সেখানে এই প্রকল্প রূপায়ণের সম্ভাবনা তত অধিক। রাজনৈতিক মহলের মতে এখানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবনার শরিক হয়ে বিজেপি তথা এনডিএ শাসিত শহরগুলি প্রতিপক্ষদের কয়েককদম পেছনে ফেলে দিতে পেরেছে। কারণ রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছার ওপরই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা অনেকাংশে নির্ভর করে। ভারতবর্ষের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যখন 'রাজনীতি' করতেই ব্যতিব্যস্ত, তখন প্রধানমন্ত্রীর নতুন ভারত গঠনের স্বপ্নের অংশীদার হতে বিজেপি ও এনডিএ জোট শরিকদের সর্বস্তরেই আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। যার প্রভাব কেন্দ্রের স্মার্ট শহর প্রকল্পেও পড়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

জানুয়ারিতে যে কুড়িটি শহর এই প্রকল্পের আওতায় এসেছিল তাদের জন্য ৪৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নেয় কেন্দ্র। পরবর্তী পর্যায়ে আরও চল্লিশটি শহর এই প্রকল্পের অন্তর্গত হয়েছে। সব মিলিয়ে ষাটটি শহরের জন্য কেন্দ্র ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৬২ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। নাগপুর ছাড়াও ইন্দোর ও সুরাট তাদের বিনিয়োগের ধার্যমাত্রা যথাক্রমে ৫০৯৯ কোটি ও ২৫৯৭ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৯৬ শতাংশের কাছাকাছি যথাক্রমে ৪৯০০ ও ২৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে।

স্মার্ট শহর মিশন প্রকল্প	
রাজ্য	আই সি আর*
নাগপুর	২৪৯
ইন্দোর	৯৬
সুরাট	৯৬
ভদোদরা	৯৫
উদয়পুর	৯০
আমেদাবাদ	৮৫
লুধিয়ানা	৭৬
পুণে	৭২
জব্বলপুর	৭০
ভুবনেশ্বর	৬৮
কোটা	৬৫
কল্যাণ-ডোম্বিভাল্লি	৬৩
কাকিনাড়	৫৫
আজমের	৪৫
জয়পুর	৩৬
নয়াদিল্লি	৩৩
থানে	২২

সূত্র : দ্য পাইওনীয়ার।

**ইনভেস্টমেন্ট কনভারশানাল রেশিও অর্থাৎ শতাংশের বিচারে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের হার।*

দলাই লামা অরুণাচলে, চীনের গোঁসা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগামী সপ্তাহে দলাই লামার অরুণাচল প্রদেশ সফর কেন্দ্র করে চীনের নাক গলানো এখনও অব্যাহত। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র গ্লোবাল টাইমস লিখেছে, 'তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামাকে অরুণাচলে সফর করতে দিয়ে ভারত চীনের নিরাপত্তাকে লঘু করে দেখার চেষ্টা করছে। এতে দু'দেশের সম্পর্কের ভয়ানক ক্ষতি হবে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে, চীনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র জেন শুয়াং বলেছিলেন, দলাই লামার এই সফর ভারত-চীনের সীমান্ত সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলবে এবং তার প্রভাব দু'দেশের সম্পর্কেও পড়বে। অর্থাৎ চীন অন্য একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর বদ অভ্যাস থেকে বিন্দুমাত্র সরেনি। যদিও ভারত এই বিষয়ে তার মৌলিক অবস্থানে অটল রয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, দলাই লামা ভারতের যে-কোনো প্রান্তে নির্দ্বিধায় যেতে পারেন।

কেরলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের হত্যার প্রতিবাদে মৌন মিছিল

কলকাতা। ছবি : শুভঙ্কর মুখার্জী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৪ মার্চ কলকাতায় মানবাধিকার মঞ্চের উদ্যোগে কেরলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে এক বিশাল মৌন মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত পরিক্রমা করে। মিছিলে অসংখ্য পোস্টার ও ফেস্টুনে কেরলে সিপিএমের নৃশংস অত্যাচারের বহু ছবি ও পরিসংখ্যান ছিল। ছিল ট্যাবলো। ছিল এক বিশাল ফেস্টুন। পথ চলতি লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয় হাজার হাজার লিফলেট যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে সেই ১৯৬৯ সাল থেকে আজ অবধি কেরলে সিপিএমের নির্মম হিংসাশ্রয়ী অত্যাচারের কথা। গত ২০১৬ সালেই ৭ জন স্বয়ংসেবক ও তাদের পরিবারেরও কয়েকজন সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। এরই বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে গত ১ মার্চ প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। কলকাতাতেও ওইদিন মিছিল হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসন অনুমতি না দেওয়ায় দিন বদল করতে হয়। মিছিল রাসমণি রোডে পৌঁছলে প্রবীণ সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত এবং বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী এই নৃশংস হত্যার জন্য সিপিএমের তীব্র নিন্দা করে মানবতা বিরোধী বলে বর্ণনা করেন। মিছিলের শেষে মানবাধিকার মঞ্চের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে এই মর্মে এক স্মারকলিপি তাঁর হাতে তুলে দেন। কলকাতা ছাড়াও শিলিগুড়ি এবং অন্যান্য জেলাকেন্দ্রে মানবাধিকার মঞ্চের উদ্যোগে কেরলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ওপর সিপিএমের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল পথ পরিক্রমা করে। বিক্ষোভে অংশ নেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।

শিলিগুড়ি। ছবি : বাসুদেব পাল

ধনী মক্কেলদের সুবিধে করে দিতে পারবেন না দিগ্‌গজ উকিলরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিখ্যাত উকিলদের পয়সাওয়ালা মক্কেলদের মামলাগুলি নিজেদের নামের জোরে দীর্ঘদিন আটকে থাকা মামলাগুলিকে টপকে যাওয়ার প্রচলিত পদ্ধতিকে বাতিল করার আদেশ দিলেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি জে এস কেহর। এমন মহাগুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রথম সাক্ষী হলেন স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী শ্রীরাম জেটমালানি।

এযাবৎ নামজাদা উকিলকে মোটা টাকা দিয়ে নিযুক্ত করলে তাঁরা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে অন্যান্য ঝুলে থাকা মামলাগুলিকে অবলীলায় টপকে তাঁদের ধনী মক্কেলদের মামলাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুনানির জন্য আদালতকে একরকম বাধ্য করতেন। অতীতের প্রধান বিচারপতিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উকিলবাবুদের নামের ভারে তাঁদের এই সুবিধে পাওয়ায় কখনও বাধা দেওয়ার কথা ভাবেননি। নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি কিন্তু পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা রক্ষার ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আদালতে কর্মরত উকিলবাবুদের নির্দেশ দিয়েছেন— ভবিষ্যতে তাঁদের মক্কেলদের মামলাগুলি অপেক্ষমান অন্যান্য বিচারপ্রার্থী মামলাগুলিকে এড়িয়ে এগিয়ে আনার কোনো আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দিল্লির কুখ্যাত উপহার সিনেমা ভেঙে পড়ে মৃত্যুর কারণে দোষীদের শাস্তি সংক্রান্ত মামলায় শ্রী জেটমালানি তাঁর মক্কেল সাজাপ্রাপ্ত গোপাল অনমালের সাজার কিয়দংশ মকুব করার মামলাটিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সবরকম চেষ্টা করছিলেন। ওই মামলায় ইতিপূর্বেই রিয়েল এস্টেট কারবারি অনমালের ১ বছর জেল হয়েছে। এই একই মামলায় আবেদনকারীর দাদা সুশীলের বার্ধক্যের কারণে সাজা মকুবের যুক্তি দেখিয়ে জেটমালানি মক্কেল অনমালেরও সাজা মকুবের শুনানি এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। জেটমালানির আবেদনে সাড়া না দিয়ে প্রধান বিচারপতি জানান— আইন মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টের মামলা নথিবদ্ধকরণ বিভাগের কোনো আপত্তি না থাকলে নিয়মমাফিক তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হতে পারে। যথারীতি নথিবদ্ধকরণ বিভাগের আপত্তি থাকায় জেটমালানি আবার মামলাটিকে এগিয়ে নেওয়ার আবেদন করলে প্রধান বিচারপতি পূর্বের প্রচলিত বিখ্যাত কৌঁসলির প্রভাবকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে জানিয়ে দেন 'প্রত্যেকের জন্যই একটি নির্দিষ্ট আইনি রূপরেখা বলবৎ আছে যা কেউই উপেক্ষা করতে পারেন না। নথীবদ্ধকরণ বিভাগের বিরুদ্ধে তিনি নিদিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আবেদন করতে পারেন।' মহামহিম ব্যবহারজীবীর এর পর আর প্রধান বিচারপতির নির্দেশ পালন করা ছাড়া করার কিছু ছিল না। প্রধান বিচারপতির এই আদেশের দীর্ঘমেয়াদী সদর্থক প্রভাব আইনি প্রক্রিয়ার ওপর পড়তে চলেছে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভি এইচ পি-র আর্জি : বিশ্বে চালু হোক অভিন্ন জনসংখ্যা নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরিস্থিতি যেভাবে দিন-দিন আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট, কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর পক্ষে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সেইজন্যেই, সম্প্রতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জনবিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখতে সারা বিশ্বে অভিন্ন জনসংখ্যা নীতি কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজে আবেদন জানিয়েছে।

ভারত দীর্ঘদিন ধরে জিহাদি সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করে আসছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি সারাবিশ্বে অভিন্ন জনসংখ্যা নীতি কার্যকর না করে তাহলে ভারতের পরিস্থিতি ক্রমশ আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে বলে জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। আমেরিকার পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করে পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. সুরেন্দ্র জৈন বলেন, 'ভারতে মুসলমানরা এখন মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ, তাতেই ইসলামি সন্ত্রাসবাদ ভয়াবহতার শিখরে পৌঁছে গেছে। এরপর ২০৫০ সালে যখন মুসলমানরা ৩০ শতাংশ হবে তখন পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'যে-কোনও অ-মুসলমান দেশের মতো ভারতও, ইসলামি সন্ত্রাসবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, এক ভয়ঙ্কর জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি বিশ্বের কোনো সেনাবাহিনী একক প্রচেষ্টায় ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করতে পারবে না।' এই প্রসঙ্গে তিনি সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি অভিন্ন জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে আবেদন জানান। ড. সুরেন্দ্র জৈন অভিন্ন জনসংখ্যানীতির মূল বিষয়গুলিতে আলোকপাত না করলেও, হিন্দু এক্সিসটেন্স ওয়েবসাইটের সম্পাদক উপানন্দ ব্রহ্মচারী জানান, যে দেশে বাস করেন সার্বিকভাবে সেই দেশের সংবিধান এবং সংবিধানে বর্ণিত জনসংখ্যা নীতি মুসলমানদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মেনে চলতে হবে। শরিয়তের দোহাই দিয়ে একাধিক বিয়ে এবং অতিরিক্ত সন্তান উৎপাদন করা চলবে না। তিনি বলেন, 'মুসলমানরা চারটে বিয়ে করে এবং গড়ে বারোটা করে সন্তান উৎপাদন করে। কোনো দেশের জনবিন্যাসে সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং জিহাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুসলমানরা এসব করেন। শরিয়তের এটাই বিধান। রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি এখনই এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না করে তাহলে ২১০০ সাল নাগাদ সারা বিশ্বে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে। তাতে বিপন্ন হবে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের অস্তিত্ব।' এই তিনি ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের ভারত সরকারের 'হাম দো হামারা দো' নীতি মেনে চলার পরামর্শ দেন।

চীনে মুসলমানদের উপর নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীন মুসলমানদের উপর কয়েকটি কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। চীনা মুসলমানদের দশম জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে চীনের ধর্মসংক্রান্ত প্রধান জানিয়েছেন, চীন যদিও কারও ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না, কিন্তু রাজনীতি, আইন ও শিক্ষা বিষয়ে মুসলমানদের নাক গলানো বরদাস্ত করা হবে না। মসজিদগুলিকে আরবের মতো নয়, চীনের স্থাপত্য শৈলী অনুযায়ী নির্মাণ করতে হবে। কোনো চীনা মুসলমান যাতে বিদেশে যেতে না পারে এজন্য তাদের পাসপোর্ট নিকটবর্তী থানায় জমা দিতে বলা হয়েছে। চীন সরকারও কোনো চীনা মুসলমানকে পাসপোর্ট ইস্যু করছে না। চীনা সূত্র অনুসারে চীনা মুসলমানদের এক বড় অংশ জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য ইসলামিক স্টেটের জঙ্গি কার্যক্রমে যোগ দিচ্ছে। তাই চীন সরকার কোনো মুসলমানকে বিদেশে যেতে দিতে রাজি নয়। চীন সরকার তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকেও এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে যে কোনো চীনা মুসলমানকে যেন দেশে ঢুকতে দেওয়া না হয়। ইন্ডিয়া পলিসি ফাউন্ডেসন ডিসেম্বর (১.১৫.২০১৬) সংখ্যায় 'সিয়াসত' (siyasat)-কে উদ্ধৃত করে এই সংবাদ প্রকাশ করেছে।

উবাচ

"আমেরিকায় ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের এমন হত্যা সে দেশের জনমনেও গভীর আঘাত দিয়েছে। এজন্য মার্কিন সরকারও সেখানকার অনাবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তায় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস নয়াদিল্লিকে দিয়েছে।"

এস জয়শঙ্কর
বিদেশ সচিব

আমেরিকায় ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনিবাস কুচিভোতলা হত্যার প্রসঙ্গে।

"সুপ্রিম কোর্ট এক আদেশে বলেছেন যে ধর্মমত, জাতপাত ইত্যাদি নির্বাচনী অভিযানের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে তা দুর্নীতির অভ্যাস বলে বিবেচিত হবে। ...এই আদেশের অর্থ প্রার্থীরা উপলব্ধি করবেন বলে মনে করি।"

নসিম জিয়াদি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে।

"আপনি নেহরু, গান্ধীকে নিন্দা করতে পারতেন? এখন তো প্রধানমন্ত্রীকে নিন্দা করেন এবং বলেন সরকার কোনো কাজ করছে না। এর থেকে আর কী 'আজাদি' আপনি চান?"

কিরেন রিজিজু
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে।

"শিবসেনা একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে। আমরা তাদের থেকে দুটি আসনে পিছিয়ে। আমাদের দলের মেয়র হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আসন আমরা পাইনি।"

দেবেন্দ্র ফড়নবিশ
মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী

বৃহৎ মুম্বাই পুরসভার মেয়র হওয়া প্রসঙ্গে।

সমীক্ষা বলছে উত্তরপ্রদেশ এবার বিজেপির

উত্তরপ্রদেশ-সহ দেশের পাঁচটি রাজ্যের ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ। এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে তখন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। ঠিক এই সময়ে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে মতামত দেওয়া আর পুকুরের পচা শামুকে পা কাটা একই রকম বিপজ্জনক। সমস্যাটা সাপ্তাহিকের লেখককে লেখা ছাপা হওয়ার পাঁচ-ছ'দিন আগে ঘটনার অনুমান নির্ভর পরিণাম লিখতে হয়। দৈনিকের সাংবাদিকের সেক্ষেত্রে লাগে ১০-১২ ঘণ্টা সময়। তাই সাপ্তাহিকের সাংবাদিকদের ঝুঁকি নিতে হয় অনেক বেশি। তবু দেশের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভার নির্বাচনকে উপেক্ষা করে অন্য বিষয় নিয়ে মতামত দেওয়া বা লেখালেখি করাটা হচ্ছে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। মনে রাখতে হবে, উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন ২০১৯-এর লোকসভার নির্বাচনের সেমি ফাইন্যাল।

এবার উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে রেকর্ড ভোট পড়েছে। ভোট হয়েছে নির্বিঘ্নে। এই রাজ্যে মুসলমান ভোট, দলিত ভোট, অনগ্রসর শ্রেণীর ভোট, উচ্চবর্ণের ভোট, সব মিলিয়ে একটা জটিল অঙ্ক। নির্বাচনে সাফল্য নির্ভর করে জাতপাতের এই রাজনীতির অঙ্ক মিলিয়ে। যেমন, দেশের খ্যাতনামা টিভি সাংবাদিক প্রণয় রায় এবং রাজদীপ সরদেশাই বলেছেন উত্তরপ্রদেশে এবার বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবে। প্রণয় বলেছেন, বিজেপি কমপক্ষে ৫৫ শতাংশ, এসপি-কংগ্রেস জোট ৩০ শতাংশ এবং মায়াবতীর বি এস পি মাত্র ৫ শতাংশ ভোট পেতে চলেছে। অর্থাৎ, মায়াবতীর মুসলমান-দলিত রাজনীতির খেলা এবার প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। দিল্লি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমসে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে রাজদীপ লিখেছেন, বিজেপি যথেষ্ট গরিষ্ঠতা নিয়ে এবার উত্তরপ্রদেশে সরকার গড়তে চলেছে। উত্তরপ্রদেশ এবার বিজেপির। তাঁর যুক্তি, ২০১৪ সালে লোকসভার নির্বাচনে বিজেপিকে ৪২ শতাংশ ভোটদাতা সমর্থন করায় রাজ্যের ৮০টি লোকসভার আসনের ৭৩টি আসন বিজেপি প্রার্থীরা পান। বিজেপির সেই ভোটব্যাঙ্ক অটুট রয়েছে। উল্টোদিকে সমাজবাদী পার্টির নেতাজী মুলায়ম সিংহের বিরুদ্ধে তাঁর পুত্র এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের বিদ্রোহ দলে ভাঙন ধরিয়েছে। পরিবার কেন্দ্রিক এই দলে চলছে মুষল পর্ব।

গূঢ় পুরুষের কলম

মায়াবতী তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবার দলের নির্বাচনী প্রচারে তেমনভাবে যোগ দিতে পারেননি। ঘরে বসে ৯৭ জন মুসলমান প্রার্থী দিয়ে মুসলমান ভোট টানতে চেয়েছেন। তাতে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। যেমন, অযোধ্যায় মায়াবতী মুসলমান ভোট টানতে প্রার্থী করেছিলেন বাজমি সিদ্দিকি নামে কট্টর হিন্দু বিরোধী এক ব্যক্তিকে। কিন্তু তিনি প্রচারে বেরতে পারেননি কারণ তিনি গণধর্ষণে অভিযুক্ত হয়ে ফেরার। অভিযোগ, বাজমি সিদ্দিকি এবং তার ছয় দোস্ত একটি মেয়েকে গণধর্ষণ করে। ধর্ষিতার অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সিদ্দিকির পাঁচ দোস্তকে গারদে পুরেছে। সিদ্দিকি ও তার এক দোস্ত আত্মগোপন করেছে। এই ঘটনা বিএসপি-কে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ফেলেছে।

এর থেকে বেশি বিপদে পড়েছে অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি। অখিলেশের এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী গায়ত্রী প্রজাপতি তাঁর দলবল নিয়ে এক মহিলা ও তাঁর নাবালিকা মেয়েকে গণধর্ষণ করে। বাহুবলী মন্ত্রী প্রজাপতি গ্রেপ্তার এড়াতে সাঙাতদের নিয়ে ফেরার হয়ে যায়। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ প্রজাপতির পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করার পর এখন তাকে ধরতে 'লুক আউট' নোটিশ জারি করেছে। এতসব ঘটে যাওয়ার পরেও অখিলেশ যাদব গায়ত্রী প্রজাপতিকে তাঁর মন্ত্রীসভায় রেখে দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল রাম নাইক চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেছেন ফেরারি মন্ত্রীকে চিঠি লিখে বরখাস্ত করা হয়নি কেন? এসপি এবং তার দোসর বিএসপি আদতে গুণ্ডা ও দুষ্কৃতিদের রাজনৈতিক দল। যদি এরা সরকারি ক্ষমতায় আসে তবে উত্তরপ্রদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষের কপালে অনেক দুঃখ থাকবে।

উত্তরপ্রদেশে এবার ত্রিমুখী লড়াই হয়েছে। বিজেপি, এসপি- কংগ্রেস জোট এবং বহুজন সমাজবাদী পার্টি। তবে বাস্তবে অধিকাংশ আসনেই লড়াইটা হয়েছে সমাজবাদী-কংগ্রেস জোটের সঙ্গে বিজেপির। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে জোট প্রার্থীদের পরাজয়ের অর্থ শুধুই অখিলেশের রাজ্যপাট হারানো নয়, প্রশ্নচিহ্ন উঠে যাবে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নিয়েও। যাদব বংশে ভাঙন ধরার সঙ্গে কংগ্রেস দলেও রাহুল তাড়াও ধ্বনি উঠবেই। নির্বাচনে বিজেপির বিপর্যয় ঘটলে মোদীর জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। উত্তরপ্রদেশের মতো সাম্প্রতিক অতীতে বিহারে একলা চলো নীতির অনুসরণ করে বিজেপি নির্বাচনে হেরেছিল। তবে বিহারে বিরোধীদের মহাজোট হয়েছিল। তাই খুব বেশি সমালোচনা হয়নি। অনেকে সপ্তরথী বেষ্টিত হয়ে মহাবীর অভিমন্যুর একক লড়াইয়ের পরিণামের কথা বলেছিলেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে বিরোধীদের মহাজোট হয়নি। অখিলেশ-রাহুলের জোটকে মহাজোট বলা যায় না। তা হলে কলকাতার গোলদিঘিকে মহাসাগর বলতে হয়। সব দিক বিবেচনা করলে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি জিতছে অথবা ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হচ্ছে। মুসলমান ও দলিত ভোট যেভাবে ভেঙেছে তাতে বিজেপির পাল্লা ভারি হতে বাধ্য।

আমার বুকে দিদির ছবি, কী করে যে মুছি!

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

আমায় ক্ষমা করবেন। এই চিঠি দিদিকে লেখার কথা ছিল। কিন্তু আপনাদের লিখছি। আসলে দিদিকে লেখার সাহস নেই। আপনারাই বলে দিন আমি কী করব। মান্না দে-র সেই গানটা তো মনে আছে। 'যদি কাগজে লেখো নাম, কাগজ ছিঁড়ে যাবে। পাথরে লেখো নাম, পাথর ক্ষয়ে যাবে। হৃদয়ে লেখো নাম, সে নাম রয়ে যাবে।' তাই হৃদয়ে লিখেছি। শুধু লেখা নয়, এঁকেছি। দিদির ছবি। তাঁর কথা, তাঁর কবিতা, তাঁর আঁকা ছবি সবই আমার প্রেরণা। তাই সবের প্রতীক হিসেবে দিদির ছবি আমার বুকে। আমার হৃদয়ে।

এমনিতেই তো রাস্তাঘাটে যে দিকে তাকাই সে দিকেই দিদি আর দিদি। নামে, ছবিতে আমার চোখ জুড়ায়। বুঝতে পারি এই বাংলার দিদি বিনে গতি নেই। দিদি ছাড়া কেউ নেই। তিনিই এই রাজ্যের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান। আমি সেদিন একটা 'জাগো বাংলা' কিনেছিলাম। দেখলাম গোটা খবরের কাগজে মোট ১৯টি ছবি। তার মধ্যে ১৮টি ছবি দিদির নানা রূপের। আর একটি ছবিতে দিদি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসে রয়েছেন।

মন্ত্রীদের ঘরে ঘরে দিদি, নেতাদের ঘরে ঘরে তিনি। পার্টি অফিস দিদিময়। শুধু কি তাই, কোথাও কোথাও দিদির ভাইয়েরা সুলভ শৌচাগারেও দিদির ছবি, নাম লিখে রেখেছে। বলেছে, তাঁর প্রেরণা ও উৎসাহেই এই মূত্রালয়। এখন তো সরকারি ইস্কুলের সব বইয়ের প্রথম পাতায় দিদির নাম লেখা থাকে। ক্লাস এইটের বইতে তো সিঙ্গুর অধ্যায়টা তাঁর নামেই উৎসর্গ করা। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও তিনি থাকবেন। আসলে তিনিই এই রাজ্যের মা, দিদি, মাটি, খাঁটি মানুষ, ফানুস। তিনি স্বপ্নের জাল বুনে দেন। তিনিই স্বপ্নের ফানুস ফুটো করে দেন।

সেই দিদি এবার বলেছেন সব ছবি মুছে দাও। কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দলের কেউ তাঁর ছবি ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইলে দলের তরফ থেকেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হবে। রাজ্যের মহাজ্ঞানী মহাজনরা বলছেন— এটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নেই। সত্যিই এটা করা হলে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর সুদীর্ঘ ঐতিহ্যটি হয়তো নিয়ন্ত্রিত হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি-সহ আপন আপন লেটারহেড ব্যবহার করে শাসকদলের কুশীলবেরা যে 'দাদাগিরি' ফলিয়ে থাকেন, তা বন্ধ করা গেলে রাজ্যের মঙ্গল। দলীয় লোকজনকে এ বিষয়ে এর আগেও সাবধান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার পুলিশি পদক্ষেপের কথা বললেন।

কিন্তু কেউ ভাবলেন না, আমার মতো দিদি সর্বস্ব ভাইদের কী হবে। দিদিই আমার সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্।

এ রাজ্যে বাম আমলে সিপিএম-করাকে বিশেষ 'ক্ষমতা' বলে মনে করা হোত। সে দলে নাম লেখালে থানার বড়বাবুও ঘাঁটাতে সাহস পেতেন না। রীতিমতো সমঝে চলতে হোত সেইসব প্রভাবশালী মানুষকে। পাড়ায় যাঁরা 'গণশক্তি' পড়তেন তাঁদের আলাদা মর্যাদা ছিল। পরিবর্তন-পরবর্তী তৃণমূল একই পথের পথিক হয়েছে। প্রভাব খাটিয়ে নামী স্কুলে-কলেজে পড়ুয়াকে ভর্তি করানো, বিনা-পারিশ্রমিকে চিকিৎসা পরিষেবা, তোলা আদায়, সিন্ডিকেটরাজ— সবই বাম আমলের মতোই চলে এসেছে। কিন্তু হঠাৎ দিদি দলের শুদ্ধকরণে তৎপর হয়েছেন। তবু সিন্ডিকেটরাজ চলছে। তবু গ্রাম-শহর-মফস্সলে দিদির ছবি সংবলিত নিজেদের লেটারহেড মারফৎ বাড়তি সুবিধা আদায় বা প্রভাব খাটানোর ঘটনা ঘটেই চলেছে।

এখন এসব চলবে না। কিন্তু সুদীপ্ত সেন কী করবেন? গৌতম কুণ্ডু কী করবেন? দিদির ছবিই তো ওঁদের ভরসা ছিল। তাঁরা দিদির আঁকা ছবি যেমন কিনেছেন তেমন নিজেদের মিডিয়ায় তাঁর ছবি ছেপে, দেখিয়ে কোটি কোটি টাকার ফয়দা তুলেছে। এখন ওঁরা জেলে। ওঁদের হৃদয়ে দিদি, এখনও দিদির ছবিই আঁকা। কুণাল, মদন, তাপস, সুদীপ সকলেই তো দিদির ছবিকে সিংহাসনে বসিয়ে ভরত সেজে শাসন চালিয়েছিল। আপনার ছবির আড়ালেই তো সারদা, রোজ ভ্যালিদের ব্যবসা চলেছে। গরিব মানুষ আপনার ছবি দেখেই তো নিশ্চিন্তে টাকা বিনিয়োগ করেছে। ভেবেছে এ বুঝি দিদিরই কোম্পানি। দিদি সততার প্রতীক। তিনি কখনও টাকা মেরে দেবেন না। সুদে আসলে ফিরিয়ে দেবেন।

বীরভূম থেকে কেষ্টদা ফোন করেছিলেন। কেষ্টদা মানে অনুব্রত মণ্ডল। ওঁর মতো দিদি অনুগামী বঙ্গদেশে নেই। যাই হোক কেষ্টদা বলছিল, লেটার হেডে দিদির ছবি ছাপা যাবে না শুনলাম। কিন্তু দিদির নামে 'গুড় মুড়ি'-র পেটেন্ট নেব ভাবছিলাম, সেটা করা যাবে কি?

আমি উত্তর দিতে পারিনি। গলা বুজে এল।

দিদি-হীন করো নাগো, মমঙ্ড্র মন
কোকনদে। তোমায় হৃদ মাঝারে
রাখব, ছেড়ে দেব না।

—**সুন্দর মৌলিক**

সীতারাম ইয়েচুরিদের ধিক্কার প্রাপ্য

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কেন্দ্রীয় সরকার যে সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল আনার প্রস্তাব দিয়েছে, সে নিয়ে আলোচনার জন্য সম্প্রতি সংসদের সিলেক্ট কমিটির একটি বৈঠক বসেছিল। বৈঠকে সভাপতিত্ব করছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব। ওই বৈঠকেই সিপিএমের সীতারাম ইয়েচুরি, তৃণমূল কংগ্রেসের ডেরেক ও'ব্রায়ান এবং কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী সমস্বরে এই প্রস্তাবিত বিলটির বিরোধিতা করেন। সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের এই তিন সংসদ সদস্যের বক্তব্য ছিল— প্রস্তাবিত এই বিলটিতে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর কথাই শুধুমাত্র ভাবা হয়েছে। অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (পড়ুন মুসলমান) কথা ভাবা হয়নি। এই তিন সংসদ সদস্যের এই ধরনের বক্তব্যে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কারণ, এঁদের পূর্বসূরিরা যেরকম ভাবনা-চিন্তা করতেন, যে পথে চলতেন— এঁরাও সেইরকমই ভাবনা-চিন্তা করেন, সেই পথেই চলেন। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত এবং নিপীড়িত হিন্দুদের চোখের জলের মূল্য এঁদের কাছে সামান্যই। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বলেছিলেন— যে হিন্দু পরিবারগুলি নিরাপত্তার খোঁজে পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশ থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে— তাদের ধর্মীয় শরণার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং তারা এদেশেই থেকে যেতে পারবে। আর পাঁচজন রাজনীতিকের মতো নরেন্দ্র মোদী তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হননি। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের নির্যাতিত হিন্দু পরিবারগুলি দীর্ঘদিন ধরে যে আশ্বাসবাণী ভারতের কাছ থেকে শোনার আশা করছিল, অবশেষে সেই আশ্বাস দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হিন্দু পরিবারগুলির পাশে নরেন্দ্র মোদী দাঁড়ানোয় ভারি গোঁসা হয়েছে সীতারাম, ডেরেক, অধীরদের। ইসলামি মন রক্ষার জন্য এঁরা এখন 'অন্য সংখ্যালঘু' সম্প্রদায়ের ধুয়ো তুলে বাংলাদেশি এবং পাকিস্তানের অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের ভারতে আশ্রয় দেওয়ার দাবি তুলছেন।

কিন্তু দাবি তুললেই তো হলো না। সেই দাবি বৈধ কিনা— তাও বিচার করে দেখতে হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ শরণার্থীর যে সংজ্ঞা দিয়েছে, সেটি জানা থাকলে বুঝতে অসুবিধা হবে না সিপিএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের তিন সাংসদের তোলা দাবি কতখানি অসাড় এবং ভিত্তিহীন। ১৯৫১-এ রাষ্ট্রসঙ্ঘের কনভেনশনে, যা ১৯৬৭ সালে প্রোটোকলে সংশোধিত হয়, তাতে শরণার্থীর সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তির জাতি, ধর্ম, নাগরিকত্ব বা কোনো সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্থার সভ্য হওয়ার কারণে নিপীড়িত হওয়ার যথেষ্ট উপযুক্ত আশঙ্কা রয়েছে বলে, তাঁর নাগরিকত্ব যে দেশের তার বাইরে রয়েছেন, অথবা এই ভীতির জন্য দেশের নিরাপত্তা নিতে আগ্রহী নন, অথবা এইসব কারণে দেশের বাইরে রয়েছেন এবং ফিরতে পারছেন না বা ভীতির জন্য ফিরতে ইচ্ছুক নন।' রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই সংজ্ঞাটি পড়লে সহজেই বোঝা যায়, এই সংজ্ঞা অনুসারে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের অত্যাচারিত হিন্দু পরিবারগুলি ও তসলিমা নাসরিনের মতো কয়েকজন ব্যক্তিত্ব যাঁরা মৌলবাদী হুমকি এবং ফতোয়ার কারণে দেশছাড়া হয়ে রয়েছেন— তাঁরাই শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় পাওয়ার অধিকারী। যেসব মুসলমান অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢুকছে— তারা কোনো অর্থেই শরণার্থী নয়, তারা নিছকই অনুপ্রবেশকারী।

এতদ্‌সত্ত্বেও ইয়েচুরি, ডেরেক ও'ব্রায়ান, অধীর চৌধুরীরা এই অনুপ্রবেশকারীদের হয়েই সওয়াল করে যাবেন; এঁদের হয়েই গলা ফাটাবেন। নির্যাতিত, অত্যাচারিত হিন্দুদের প্রতি এঁদের পূর্বসূরিদের অবজ্ঞা এবং অবহেলা ছিল— সেই অবহেলা এবং অবজ্ঞা এঁরাও করে চলেছেন। দেশভাগ পর্বে কংগ্রেস নেতা এবং দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু চানইনি পূর্ববঙ্গ থেকে অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত হিন্দু পরিবারগুলি ভারতে আশ্রয় পাক। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-সহ বহু বিশিষ্টজন যখন সংখ্যালঘু বিনিময়ের কথা বলেছেন, তাতে কর্ণপাতই করেননি নেহরু। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন, 'যখন স্বাধীনতার পর পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও সর্বস্বান্ত এবং চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল তখন পশ্চিমবাংলায় আন্দোলন আরম্ভ হইল যে, যত সংখ্যক হিন্দু বিতাড়িত হইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে সেই সংখ্যক মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে পাঠাইয়া নবাগত হিন্দুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হউক। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জওহরলাল গান্ধীজীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিলেন যে, ইহা ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাজ্যে (secular state of India) অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে নির্দেশ দিলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লওয়া বন্ধ করিতে হইবে। যে দু'খানি চিঠিতে নেহরু এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা চিরকাল মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলালের দুরপনেয় কলঙ্ক ও নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে?'

বামপন্থীরা তো আরো এককাঠি সরেস। এরা হিন্দু উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি করেছে। আর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেলেই এই উদ্বাস্তুদের উপরই বর্বর আক্রমণ চালাতে দ্বিধা করেনি। তার প্রমাণ মরিচঝাঁপি। ছয়ের দশকে পূর্ববঙ্গ থেকে যে নমঃশূদ্র পরিবারগুলি আশ্রয়ের খোঁজে ভারতে চলে এসেছিল, তাদের ওড়িশার দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল কেন্দ্র সরকার। সেই সময় বামপন্থী নেতারা দণ্ডকারণ্যে গিয়ে এই হিন্দু

উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন— পশ্চিমবঙ্গই তোমাদের প্রকৃত আশ্রয়স্থল। দণ্ডকারণ্য নয়, পশ্চিমবঙ্গই তোমাদের আশ্রয় দেবে। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর দণ্ডকারণ্য থেকে এই হিন্দু উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে এসে সুন্দরবন অঞ্চলের মরিচঝাঁপিতে বসতি গড়ে তোলেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছিল বামফ্রন্ট সরকার? ১৯৭৮-৭৯ সালের ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে মরিচঝাঁপি অবরোধ করে, গুলি চালিয়ে, নির্বিচারে নারী পুরুষ হত্যা করে জঘন্য নৃশংসতার এক নজির রেখেছিল বামফ্রন্ট। কীরকম অত্যাচার করেছিল জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট? কয়েকটি উদাহরণ দিই। সুন্দরবনের প্রাক্তন সাংসদ শক্তি সরকার লিখেছিলেন, 'এই উদ্বাস্তুরা অন্য রাজ্য থেকে আসা অবাঙালি অধিবাসীদের মতো কলকাতার ফুটপাত বা রেল স্টেশন দখল করতে চাননি, তাঁরা সত্যি সত্যিই পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়ে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হাসনাবাদে না যেতে দিয়ে, বর্ধমানের কাশীপুরে গুলি চালিয়ে ৬ জনকে মেরে জোর করে অনেক উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠাল। বামফ্রন্ট নেতারা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন— কাউকে সেবাকাজ করতে দেননি। এমনকী শিশু বৃদ্ধদের দুধও দিতে দেননি। ফলে হাসনাবাদে প্রায় দেড় হাজার শিশু ও বৃদ্ধ বিনা চিকিৎসায় মারা যান। (মরিচঝাঁপি— সম্পাদনা নিরঞ্জন হালদার)

১৯৭৮-এর ২৫ জুলাই, যুগান্তর পত্রিকায় পান্নালাল দাশগুপ্ত লিখেছিলেন— 'যে সমস্ত পরিবার আজ ওখানে (দণ্ডকারণ্যে) ফিরে আসছেন, তাঁদের প্রায় সকল পরিবার থেকে শিশু অথবা বৃদ্ধ, অথবা দুই-ই তাঁরা পথে পথে চিরদিনের মতো হারিয়ে এসেছেন। তাঁদের শোক, দুঃখবোধও এই প্রচণ্ড আঘাতে ও প্রতারণায় বিফল। ফেরতগামী ট্রেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ২-৩ জন করে অফিসার পাঠানো হচ্ছে শরণার্থীদের তদারকি করার জন্য। তাঁদেরই মুখে শুনলাম, ফিরবার পথে মৃত শিশুদের ও বৃদ্ধদের তাঁরা ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছেন। পরবর্তী কোনো স্টেশনে তাদের সদ্‌গতি করার জন্য অপেক্ষা করেননি।'

একটি বামপন্থী দৈনিক কালান্তর কী লিখেছিল সেই সময়? কালান্তর লিখেছিল— '২৪ জানুয়ারি থেকে সরকার দ্বীপ অবরোধ করে। ৩১ জানুয়ারি গুলি চলেনি। ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের ইনজাংশন অনুযায়ী জল-অন্ন আনার ওপর থেকে বাধা প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু এর পরেও কড়াকড়ি চলছে। ...একমাত্র ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখেই চাল আনতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন অনন্ত মণ্ডল, অরবিন্দ রায়, নিরঞ্জন বাড়ৈ, কার্তিক সরকার, রণজিৎ মণ্ডল, কৃষ্ণদুলাল বিশ্বাস। ...২৪ জানুয়ারি সরকারের পক্ষ থেকে দ্বীপ অবরোধ করার পর ওখানে অনাহারে মারা গিয়েছেন ৪৩ জন।' (কালান্তর, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯)। এই হচ্ছে বামপন্থীদের প্রতারণা এবং নৃশংসতার ইতিহাস। অবশ্য সমগ্র বিশ্বেই বামপন্থীদের ইতিহাস প্রতারণা ও নৃশংসতারই ইতিহাস। এর ভিতর কোনো মানবতার স্থান নেই। এই প্রতারণা এবং দ্বিচারিতার ইতিহাসটি বর্তমান প্রজন্মকে সবিস্তারে জানানো প্রয়োজন। হিন্দু শরণার্থীদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য নেহরুরও ছিল না। কারণ নেহরু নিজেকে হিন্দু বলেই মানতে চাইতেন না। বলেছিলেন, আই অ্যাম এ হিন্দু বাই অ্যাকসিডেন্ট। এদের ধ্বজা যাঁরা এখন বহন করে চলেছেন, তাঁরা আজ মানবিক দৃষ্টি দিয়ে হিন্দু শরণার্থীদের দেখবেন— এমন আশা করাও বৃথা।

সীতারাম ইয়েচুরি, ডেরেক ও' ব্রায়ান, অধীর চৌধুরীদের সমস্যা হলো, ভারতবর্ষ যে প্রকৃত অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর নিজস্ব আবাসভূমি, এর দখলদারিত্ব যে আর কেউ দাবি করতে পারে না— সেই ঐতিহাসিক সত্যটিই এঁরা মেনে নিতে পারেন না। ১৯৪৭ সালে যখন ভারত ভেঙে মুসলিম লিগ মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল— সেইদিনই ইতিহাসে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, ভারতবর্ষ হিন্দুদের স্বীকৃত আবাসভূমি। সে নেহরু এবং তাঁর পারিষদরা না চাইলেও। বিশ্বের যে প্রান্তে হিন্দুরা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হবেন— তাঁরা ভারতকেই তাঁদের আশ্রয়স্থল হিসাবে খুঁজে নেবেন—এটাই স্বাভাবিক। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর এই রাষ্ট্রে তাঁরা তাঁদের নিরাপত্তা পেতে চাইবেন— এটাই স্বাভাবিক। কাজেই পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে আজ যদি হিন্দুরা অত্যাচারিত এবং লাঞ্ছিত হয়ে ভারতে চলে আসেন— তাহলে তাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখতে হবে। এই অসহায় হিন্দুদের আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব ভারত এড়িয়ে যেতে পারে না— এটাও মনে রাখতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারগুলি মানবিক দৃষ্টি দিয়ে বিষয়টিকে দেখেনি। নির্যাতিত হিন্দুর কাতর আহ্বানে কর্ণপাতই করেননি তাঁরা। নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী হচ্ছেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার হচ্ছে প্রথম সরকার— যাঁরা মানবিকভাবে সমস্যাটি দেখলেন ও নির্যাতিত হিন্দুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। নির্যাতিত হিন্দুর পাশে যে তিনি থাকবেন, সে বার্তা মোদী বাংলাদেশ সফরে ঢাকার প্রাচীন ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে দিয়েও এসেছিলেন। এর আগে কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় গিয়ে হিন্দুদের ওই প্রাচীন মন্দিরটি পরিদর্শন করেননি। কাজেই মন্দির পরিদর্শনের ভিতর কী বার্তা মোদী দিতে চেয়েছিলেন— তা স্পষ্ট।

যে দায়িত্ব এতদিন ভারত বিস্মৃত হয়েছিল, যে দায়িত্ব ভারত এতদিন পালন করেনি— সে দায়িত্ব ভারতকে মনে করিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। সমগ্র বিশ্বে হিন্দুদের কাছে মোদী ধন্যবাদার্হ হবেন। হিন্দুরা তাঁর উপরই আস্থা রাখবেন। আর ইয়েচুরি, ডেরেক ও'ব্রায়ান, অধীর চৌধুরীরা? ইতিহাসে এঁরা চিহ্নিত হয়ে থাকবেন সেইসব নিন্দিত মানুষ হিসাবে— যাঁরা দুর্গত এবং আর্তের করুণ আবেদনে সাড়া দেননি। শতসহস্র ধিক্কার এঁদের।

তথ্যসূত্র :

(১) মরিচঝাঁপি—সম্পাদনা নিরঞ্জন হালদার। (২) মরিচঝাঁপি ছিন্ন দেশ ছিন্ন ইতিহাস— সম্পাদনা মধুময় পাল। (৩) রমেশচন্দ্র মজুমদার রচনা সংগ্রহ।

চৈতন্যদেবের সংগঠনশৈলী আজও আদর্শ

মহামহোপাধ্যায় ড. সীতানাথ গোস্বামী, বেদবেদান্তব্যাকরণতীর্থ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়ের মুখ্য ভিত্তি ও প্রধান স্তম্ভ ছিল প্রেম, ভালবাসা বা সর্বত্র আত্মত্বের অনুভূতি। নিজের ধনসম্পদ মানুষের কাছে প্রিয়, তার থেকেও প্রিয় পুত্রকন্যাদি, তদপেক্ষা প্রিয় নিজের পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। এই সবের থেকে বেশি প্রিয় আত্মা। মহাপ্রভু তাঁর শিষ্যবর্গকে বোঝালেন যে, নিজের আত্মার মতো যখন অন্য সকলকে ভালবাসতে পারা যাবে তখনই আমাদের মধ্যে যথাযথ প্রেমের উদগম হয়েছে বুঝতে হবে। এর দৃষ্টান্ত স্বয়ং হরিদাস। মুলুকপতি হরিদাসকে বোঝাতে লাগলেন—

কেনে ভাই, তোমার কিরূপ দেখি মতি।
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন।
আমরা হিন্দুকে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত।।
(চৈতন্যভাগবত, আদি, একাদশ অধ্যায়)

হরিদাস এই কথা শুনে প্রথমে খুব হাস্য করলেন ও পরে বললেন—

শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর।

কাউকে ধর্মান্তর না করে, কারও ওপরে অত্যাচার না করে কেবলমাত্র ভালবাসার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব সারা ভারতবর্ষে সাড়া জাগিয়েছিলেন। অদ্বৈত, দ্বৈত নিয়ে সংঘর্ষ করেননি। নিজে দ্বৈতবাদী হয়ে অদ্বৈতবাদী পুরী সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে,
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।। ...(তত্রৈব)

এই সব বলার পরে হরিদাস আরও বললেন— 'যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার।' এসব শুনে কাজি মুলুকপতিকে বললেন— 'শাস্তি করহ ইহারে' এবং শেষে কাজির বক্তব্য—

বাইশ বাজারে নিঞা মারি।
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি।।
বাইশ বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে।
তবে জানি, জ্ঞানী সব সাঁচা কথা কহে।। (তত্রৈব)

এমন নির্দয় প্রহারে 'দুঃখ না জন্ময়ে হরিদাস ঠাকুরেরে'। যখন যবনেরা আলোচনা করছে যে, দু'তিন বাজারে মারলেই প্রাণ যাওয়ার কথা কিন্তু একে বাইশ বাজারে মারলেও 'মরেও না, আরো দেখি হাসে ক্ষণেক্ষণে'। শেষে যখন তার প্রাণ নেই ধরে নিয়ে তাকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হলো তখনও তিনি জীবিতই ছিলেন। আশ্চর্য হরিদাসের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা যে,

সবে যে সকল পাপিগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখমাত্র ভাবেন অন্তরে।।
'এসব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ
মোর দ্রোহে নহু এ-সভার অপরাধ।।' (তত্রৈব)

হরিদাসের মধ্যে আমরা পাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এই হরিদাসের সহিষ্ণুতা ও প্রেমই চৈতন্যদেবের প্রেম প্রচারের প্রথম দৃঢ় ভিত্তি বলা যায়। যদিও হরিদাস সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ছিলেন বিধর্মী যবন।

যবন হরিদাস যেমন মহাপ্রভুর আদর্শকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন তেমনই নিতাই, যাকে অদ্বৈত প্রায় সর্বদাই মাতাল বা মাতালিয়া বলতেন, মহাপ্রভুর বৈষ্ণব মত প্রচারের প্রধান স্তম্ভ হয়েছিলেন। নিত্যানন্দ ভূয়োদর্শী এবং দীর্ঘ বিশ বছরের ভারতপর্যটক। নিত্যানন্দের বয়স যখন মাত্র ১২ বছর তখন একজন

সন্ন্যাসী তাঁর পিতা হাড়াই ওঝার কাছে এসে নিত্যানন্দকে তাঁর সঙ্গী করে তীর্থভ্রমণে যাবার প্রস্তাব দিলেন। সন্ন্যাসীর পরিচর্যা ও তীর্থভ্রমণের কথা শুনে হাড়াই ওঝা সম্মত হয়ে গেলেন। একটানা ২০ বছরের তীর্থভ্রমণে নিত্যানন্দের যে অভিজ্ঞতা হলো তা একদিক থেকে অসাধারণ বলা যায়। এই দীর্ঘ পর্যটনের সময়ে মধ্যে মধ্যেই তিনি নির্জনে থাকতেন। একবার বনে ভ্রমণ করার সময়ে মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরম ভক্ত ও ভক্তিমার্গের অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক মাধবেন্দ্র পুরীকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন প্রধান স্থপতি বলা চলে। তিনি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ গুরু এবং শ্রীচৈতন্যদেবের পরম গুরু। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর কাছে চৈতন্যদেব দশাক্ষর মন্ত্র পেলেন।

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে পিতৃশ্রাদ্ধের অবসরে গয়াতে মহাপ্রভুর দেখা হলো।

ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
নমস্করিলেন অতি করিয়া আদর।।
ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্ররে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহা হর্ষ হৈয়া।।

(চৈঃ ভাঃ, আদি, দ্বাদশ অধ্যায়)

গৌরচন্দ্র ঈশ্বরপুরীকে বললেন— 'তোমাকে দেখলেই কোটি পিতৃগণ তৎক্ষণে সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত হয়। আমি তোমার কাছে আমার দেহ সমর্পণ করলাম, তুমি আমাকে উদ্ধার করো।' ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রের প্রশংসা করে বললেন যে, তাঁর এই চরিত্র, এই পাণ্ডিত্য ঈশ্বর-অংশ ছাড়া হতে পারে না। তাঁকে দেখে ঈশ্বরপুরী এতই তৃপ্ত হয়েছিলেন যে, গৌরদর্শনে তাঁর 'পরানন্দসুখ' হচ্ছিল এবং স্পষ্টই বললেন, 'কৃষ্ণ দরশন সুখ তোমা দেখি পাই।' পরস্পর মিষ্ট ভাষণের পরে গৌরচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধে বসলেন।

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মহাপ্রভুর এই সাক্ষাৎ ও কথোপকথন বলার উদ্দেশ্য এই যে, দশনামী সম্প্রদায়ের, বিশেষত পুরীপদবির আচার্যগণই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বহু পর্যটনে পরম অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের নবদ্বীপেই প্রকাশ হয়েছে, একথা জেনে নবদ্বীপে এসে নন্দন আচার্যের গৃহে অবস্থান করলেন। নিমাই হরিদাস ও শ্রীবাসকে নিয়ে নিত্যানন্দকে দর্শন করলেন। দু'জন দু'জনের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইলেন— নিতাই তাঁর ঈশ্বরকে দেখলেন, চিনলেন আর নিমাই তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুগামী ও প্রচারককে পেলেন।

শ্রীবাসের বাড়িতে মহাপ্রভুর অভিষেক হলো। মহাপ্রভুকে ১০৮ কলসি গঙ্গাজলে স্নান করানো হলো। মহাপ্রভু তাঁর নেতৃত্বসূচক এই অভিষেকের পরেই সকলকে বর দিলেন। অদ্বৈতকেও বর দিলেন। নিত্যানন্দকে তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতিতে আর বর দিলেন না। বরঞ্চ তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতিতে তাঁর কৌপীনের একটি একটি টুকরা সকলকে বিতরণ করলেন। নেতা অদ্বৈতের সমক্ষে অভিষেকের পরবর্তী ক্ষণেই প্রতিজ্ঞা করলেন—

ব্রহ্মা ভব নারদাদি যারে তপ করে।

বাংলাদেশের বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের মূর্তি।

হেন ভক্তি বিলাইমু বলিনু তোমারে।।

(চৈ: ভা: মধ্য ৬ অধ্যায়)

অদ্বৈত কিন্তু নিমাইকে বললেন—

অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা
শ্রীশূদ্র আদি যত, মূর্খেরে সে দিবা।...
আচণ্ডাল নাচুক তোর নামগুণ গ্যায়া।। (তত্রৈব)।

এখানেই প্রভু তাঁর কর্মপথের দিগ্‌দর্শন পেলেন বর্ধিষ্ঠ আচার্য অদ্বৈতের কাছে। অদ্বৈতের আনন্দের সীমা নেই, কারণ তিনি তো এ জিনিস অনেকদিন থেকেই চেয়েছিলেন এবং তা কবিরাজ গোস্বামীর কথায় পরিস্ফুট—

কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিলা।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিলা।।

(চৈ: চ: অন্ত্য, ৩য় পরিচ্ছেদ, ২২২)

অদ্বৈতের পূজা ও তুলসী দান যেমন কৃষ্ণাবতারের উপযুক্ত উপচার রূপে নির্ধারিত ছিল তেমন হরিদাসের নামসংকীর্তনও এই কার্যের সিদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছিল। একথা তো কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টই বলেছেন—

দুই জনের ভক্তে চৈতন্য কৈল অবতার।
নামপ্রেম প্রচারি কৈল জগৎ উদ্ধার।।

(চৈ: চ: অন্ত্য, ৩য়, পরিচ্ছেদ ২২৪)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, চৈতন্যদেব বাংলায় মুসলমান

আমলে হিন্দুদের ওপর যেসব অত্যাচার হয়েছে তার প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য তিনি যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল বহু চিন্তাপ্রসূত। যে-যার নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে না, বলপূর্বক অপরের উপরে আক্রমণ-অত্যাচার নয়, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে এক অপার আনন্দহিল্লোল যা সর্বদাই প্রবহমান তার সাহায্যেই এবং তাকে উদ্রিক্ত করে সকল বেদনার অবসান করতে চেয়েছিলেন। প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করে তিনি যে আন্দোলন প্রারম্ভ করেছিলেন তা দেখি শ্রীঅদ্বৈতের ত্যাগতপস্যা বৃথা যায়নি, তাকে যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছেন। হরিদাসের ব্যাপক অভিজ্ঞতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা তথা মনের ঔদার্যকে কাজে লাগিয়েছেন। নিত্যানন্দের দীর্ঘকাল ব্যাপী, প্রায় ২০ বছর, পর্যটনের শিক্ষাও তিনি এই আন্দোলনের অন্যতম ভিত্তিরূপে দাঁড় করিয়েছিলেন। দু'জন মুসলমান রাজকর্মচারী যেমন দবির খাস্ ও সাকর মল্লিককে তাদের যোগ্যতার জন্য সম্মান দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গোপনে সাক্ষাৎ করেছেন ও তাদের মনের গ্লানি দূর করার উপায় বলে দিয়ে তাদের নিজের আন্দোলনের যোগ্য করে তুললেন— রূপকে তিনি বৈষ্ণবদর্শনের রসতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন এবং সনাতনকে দরবেশের সাজে রাজার কঠিন নাগপাশ থেকে মুক্ত করে কাশীতে অপেক্ষা করলেন তাঁর আগমনের জন্য। পরে তাঁকেই লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের দায়িত্ব দিলেন। অপার ভালবাসা নিয়ে প্রভু যেভাবে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন ও সর্বাঙ্গে শ্রীহস্তের দ্বারা তাকে আদরপূর্বক তৃপ্ত করলেন যে, তার আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই যেন রইল না। প্রভুর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিল। প্রভু তাকে নিজের আসনের পাশে বসালেন।

তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি' লঞা গেলা।

পিণ্ডার উপরে তাঁরে আপন-পাশ বসাইলা।।

শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জন।

তেঁহো কহে,—'মোরে প্রভু, না কর স্পর্শন।।'

প্রভু কহে,—'তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।

ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে।।

(চৈ: চ:, মধ্য, ২০/৫৪.৫৬)

অকুণ্ঠ ভালবাসা। যার অপর নাম প্রেম বা রস, তা সকলকেই আনন্দ দেয়। রস তাকেই বলে যা আস্বাদ করা হয় এবং তাতে প্রীতি জন্মায়। এই রসই হলেন তিনি— 'রসো বৈ সঃ'। পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম কৃষ্ণও তো রসস্বরূপ। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় ছিল কেবল হানাহানি, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা এবং এরই জন্য কেবল যে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ছিল তা নয়, সর্বত্রই ছিল অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদ ইত্যাদি নীচবৃত্তিসমূহ। পরমানন্দকন্দ স্বয়ং ভগবানই এই অবস্থার অবসান ঘটাতে পারেন যদি আমরা সেই অখিলরসামৃতমূর্তি কৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করে এই প্রেম-ভালবাসাকে জীবনে গ্রহণ করতে পারি। এর জন্য কাউকে অগ্রণী হতে হয়, স্বার্থত্যাগ করতে হয়, সকল জীবে প্রেমভাব আনতে হয়। কাউকে ধর্মান্তর না করে, কারও ওপরে অত্যাচার না করে কেবলমাত্র ভালবাসার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব সারা ভারতবর্ষে সাড়া জাগিয়েছিলেন। অদ্বৈত, দ্বৈত নিয়ে সংঘর্ষ করেননি। নিজে দ্বৈতবাদী হয়ে অদ্বৈতবাদী পুরী সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভারতীয় সভ্যতা এবং বেদ ও বেদান্তের সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করে সারা বিশ্বকে এই দেশ জানিয়ে দিল— Intence love is the basis of our success, এই দেশ আবার তার পুরানো আদর্শকে মূর্ত করে দেখিয়ে দিতে চায়—

সর্বেঽপি সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তি মা কশ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ।।

আমরা শিবভক্ত হই বা কৃষ্ণভক্তই হই তাতে কোনো পার্থক্য হয় না, কারণ সকলেই জানেন বা অবশ্যই জানা উচিত যে শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, গণপতি এই সকলেই এক পরমদেবেরই স্বরূপ। আচার্য শঙ্করের মতো আমরাও যেন বলতে পারি—

মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।

বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।। (অন্নপূর্ণাস্তোত্র, ১২)

আমরা শিবভক্ত হই বা কৃষ্ণভক্তই হই তাতে কোনো পার্থক্য হয় না, কারণ সকলেই জানেন বা অবশ্যই জানা উচিত যে শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, গণপতি এই সকলেই এক পরমদেবেরই স্বরূপ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সমাজ সংস্কারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যাকাশে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কস্বরূপ। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মান্ধতা, ভেদবুদ্ধি এবং কুসংস্কারে ভারতবাসীর জীবন বিপর্যস্ত ছিল। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই ক্ষাত্র-পরিপুষ্ট ভেদবুদ্ধি সমাজের সাধারণ মানুষকে পীড়িত করছিল। বুদ্ধদেব এসে যদিও অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন তবুও পরবর্তীকালে নাস্তিক্যবাদ, সৌরতন্ত্র, হীনযান, মহাযান, বজ্রযানাদি প্রভৃতি কূট নিয়মে মানবসমাজে কল্যাণের পথ আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে যায়। তৎপরবর্তীকালে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদাদি প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষেরা ছিল এই সব বিষয় থেকে বহু দূরে। আর শূদ্র জাতীয় সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছিল সমাজে ঘৃণিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত। তাদের জীবন ছিল ভারবাহী পশুর মতো। গলায় ঘণ্টা বেঁধে তাদের পথ চলতে হোত। তারপর আবার বাংলার সেন রাজগণ জাতিভেদকে শতধা ভাগে ভাগ করলেন। ওই সময় সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হলে উচ্চ শ্রেণীর নিষ্পেষণে শূদ্র জাতীয় সাধারণ মানুষ প্রবলভাবে হাঁপিয়ে উঠলো। অনন্তর তুর্কির আক্রমণে জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত হলো, আর মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠান সমূহ ধ্বংস হতে লাগলো, জনজীবন ভীষণভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। বিদেশিদের আক্রমণে ভারতবাসীর ধর্মজীবনে বিপর্যয় নেমে এলো। মুণ্ড নিয়ে গেন্ডু খেলার ভয়ে হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। সমাজের এই প্রকার দুরবস্থা দর্শন করে শান্তিপুর নাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সনাতন বৈদিক সমাজকে সঙ্কটময় পরিস্থিতি হতে রক্ষা করার জন্য তুলসী-গঙ্গাজলে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে উপনীত হলে ১৪০৭ শকের (১৪৬৮ খ্রি.) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীশচীদেবী-জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে নবদ্বীপের কেন্দ্রস্থল শ্রীমায়াপুরে আবির্ভূত হন। সুমহান ব্যক্তিত্বের জনক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বিশেষ এক তাৎপর্যমণ্ডিত যুগান্তকারী ঘটনা।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবক্ষয়ের দিনে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে সহস্র সূর্যের মতো দশদিক আলোয় উদ্ভাসিত করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। তাঁর আবির্ভাবে সমাজজীবনে ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিশেষ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি ছিলেন এক মহান বিপ্লবী সমাজ-সংস্কারক।

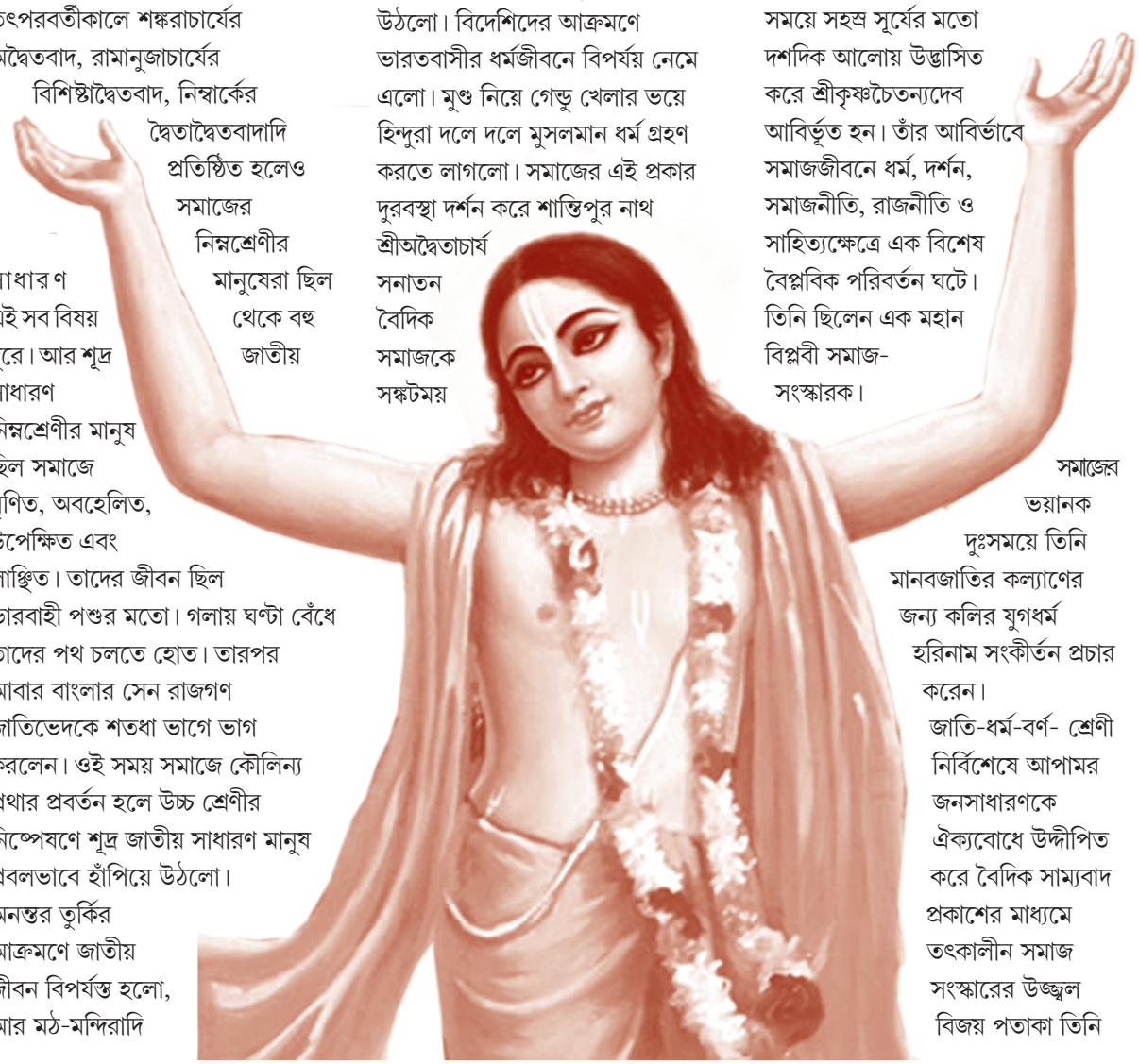

সমাজের ভয়ানক দুঃসময়ে তিনি মানবজাতির কল্যাণের জন্য কলির যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ- শ্রেণী নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবোধে উদ্দীপিত করে বৈদিক সাম্যবাদ প্রকাশের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ সংস্কারের উজ্জ্বল বিজয় পতাকা তিনি

ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্র প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোনো ভেদ নেই। চণ্ডাল যদি হরিভক্তি পরায়ণ হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হরিভক্তি পরায়ণ যবন হরিদাসকে তিনি আচার্যত্ব দান করলেন। খোলাবেচা দরিদ্র শ্রীধর হতে গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র, মহাপাপী জগাই-মাধাই হতে রাজমন্ত্রী রূপ-সনাতন পর্যন্ত আপামর মানুষকে তিনি শ্রীহরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে একত্রিত করে মানবতার স্বাভাবিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনেন। ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ম্লেচ্ছ, উচ্চ-নীচ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তিনি মানবতার এক আসনে বসবার সুযোগ দান করলেন শ্রীহরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে। অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, কলুষিত মূঢ় ম্লান সমাজকে প্রেম, স্নেহ- ভালোবাসার মন্ত্র দিয়ে তিনি ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মকে রক্ষা করলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জানতেন, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতায় আতঙ্কিত, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও কলহে শতধা বিভক্ত, ভেদবুদ্ধি কলুষিত সমাজের মধ্যে একটা স্থায়ী কল্যাণকর পরিবর্তন আনতে হলে নতুন দৃষ্টিতে ধর্ম সংস্থাপন করতে হবে। আর সেই দৃষ্টি হলো স্নেহ-প্রেম ও অহিংসার দৃষ্টি। তিনি সর্বপ্রথম অহিংসার পথে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্তন করেন। তৎকালে নবদ্বীপের শাসক চাঁদকাজী আদেশ জারি করেছিলেন— নগরে বা গৃহে কেউ হরিনাম সংকীর্তন করলে সে দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সদলে হুঙ্কার দিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যাকালে চাঁদকাজীর অঙ্গনে গিয়ে উচ্চস্বরে শ্রীহরিনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবমণ্ডিত ও গম্ভীর মুখমণ্ডল, অহিংসা প্রেমের নির্ঝর, অপার করুণাপূর্ণ দৃষ্টি দর্শন মাত্রেই চাঁদকাজী মুগ্ধ, অভিভূত এবং ভীত হয়ে তাঁর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে শ্রীহরিনাম সংকীর্তন করার অনুমতি প্রদান করলেন। তারপর বলেন, 'আমার বংশের কেউ যদি শ্রীহরিনাম সংকীর্তনে বাধা দেয় আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব।' এটি অহিংসার পথে আইন অমান্য আন্দোলনের ও তার সাফল্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই তার সর্বপ্রথম প্রবর্তক। প্রেমের দ্বারা সকল প্রকার শত্রুতা ও বিদ্বেষ ভাব যে দূর যায় তা তিনি নিজ জীবনে এভাবে দেখিয়েছেন। অস্পৃশ্যতা বর্জন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আশ্রয় দান, প্রেম বিতরণ করে শ্রীহরিনামে উন্মুক্তকরণ— এ সকলের মধ্য দিয়েই তিনি বাস্তব সমাজ সংস্কারের রূপটি উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর অহিংসক সাম্যনীতি, আর অমৃতময় মধুর জীবনের ছোঁয়াচ পেয়ে সমাজজীবনে এক জাগরণ প্রকটিত হলো। একেই বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রেনেসাঁস বা সমাজের নবজাগরণ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সুকোমল প্রেমিক হৃদয় হলেও জগৎ ও জীবের মঙ্গলের জন্য আত্মসংযম ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের দ্বারা সংস্কার বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর সংযম, তিতিক্ষা, সৌন্দর্য, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অনন্য সুলভ পাণ্ডিত্য প্রকর্ষ, স্বভাব সুলভ কোমল বাক্যালাপ, বিনয়গর্ভ অমায়িক ব্যবহার ইত্যাদি দিব্যগুণাবলী সকল শ্রেণীর লোকের চিত্তাকর্ষক ছিল। এ জন্যই তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে তৎকালীন সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই সমভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। এতে নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য, কাশীবাসী সন্ন্যাসী কুলগুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী, দুর্বিনীত পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ্য বিজলি খান, নবদ্বীপের শাসনকর্তা মওলানা সিরাজউদ্দিন চাঁদকাজি, গৌড়ের বাদশা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, বিপক্ষ নৃপতি কুল তিলক মহারাজ প্রতাপরুদ্র, বনদস্যু সর্দার নারোজী ও তার দলবল, দুর্বৃত্ত জগাই-মাধাই প্রমুখ বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যচরণের আনুগত্য স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক রঘুনাথ, সরলবুদ্ধি শ্রীবাস পণ্ডিত, অতি দরিদ্র খোলাবেচা শ্রীধর, রাজমন্ত্রী শ্রীরূপ ও সনাতন, তৎকালীন বারোলক্ষ মুদ্রা আয়ের জমিদারির অধিপতি রঘুনাথ দাস, রাজা রামানন্দ রায় প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি গুণাকৃষ্ট হয়ে চিরতরে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর দিব্যগুণাবলীতে জগৎবাসী মুগ্ধ। তাঁর প্রচারিত আদর্শ সমাজের সকলের জন্যই কল্যাণজনক।

ভেদবুদ্ধি কবলিত কলঙ্কিত সমাজজীবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সাম্যচিন্তার আজ প্রয়োজন রয়েছে। নগর কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি সকল স্তরের মানুষকে প্রেমধর্মের পথে টেনে নিয়েছিলেন, এই ধর্মপথে সকলেই পেয়েছে মানবতার অধিকার। এই সংগঠন একটি বড় মহাশক্তি। এই সংগঠনের মাধ্যমেই তিনি মনুষত্বের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। আর সেখানেই সমাজের সকল মানুষ সাম্যের স্বাদ পেয়েছিল। আজকের দিনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত আদর্শ অত্যন্ত প্রয়োজন। ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় তাঁর শুভ আবির্ভাব দিবসে আমরা সকলে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি আমাদের সকলের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করুন। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

বাবরি বিতর্ক

গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মুসলমান ভোট ভিখারি দলগুলি এবং সেক্যুলারবাদীদের আর্তনাদে ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে। তাদের প্রধান অভিযোগ হিন্দুত্ববাদীরা একটি ঐতিহাসিক মসজিদ ধ্বংস করে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। পক্ষান্তরে স্বাধীনতার পর কাশ্মীরে মুসলমানরা যে সমস্ত হিন্দু মন্দির ধূলিসাৎ করেছে তা নিয়ে তারা কোনো উচ্চবাচ্য করে না। মুসলিম লিগের মুখপত্র একটি বাংলা দৈনিকে জনৈক প্রবন্ধকার 'বাবরি মসজিদ, ইতিহাস ও ধর্মনিরপেক্ষতা' নামক এক বিশাল প্রবন্ধে লিখেছেন— 'জোর করে দখল করা স্থানে গড়ে ওঠা মসজিদে নমাজ পড়া ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং মুসলমানদের পক্ষে জবরদখলকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব নয়।' এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বহৃদয় পাঠকমহোদয়দের অবগতির জন্য জানাই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় যে বায়তুল মকরম মসজিদ তৈরি হয়েছে সেখানে একসঙ্গে ১৫০০০ মুসলমান নমাজ আদা করতে পারে। সেটা কি জবর দখল করা জায়গা নয়? সেটা ছিল ঢাকার হিন্দু বিধবা আশ্রম। তার নামে ছিল একটা টোল। অবিনাশ ভট্টাচার্য নামে এক পণ্ডিত তা চালাতেন। এর কাগজপত্র এখনো আমার এক বন্ধুর হেপাজতে আছে (পত্রলেখক একজন ঢাকার লোক, বিতাড়িত উদ্বাস্তু)। তাছাড়া ভারত সরকারের আরকিওলজিকাল বিভাগের হিসেব অনুসারে মুসলমানরা ৩৯৯৯৭টি মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করেছে। সেখানে কি মুসলমানরা নমাজ আদা করে না? এবার কিছু ঐতিহাসিকের লেখা থেকে কয়েকটা মাত্র উদ্ধৃতি দিচ্ছি যাতে প্রমাণিত হবে রামমন্দির ভেঙেই ওই স্থানে বাবরিধাঁচা নির্মিত হয়েছে।

(১) বিখ্যাত ঐতিহাসিক কে. এম. লাল লিখেছেন, ১৫২৮ সালে বাবরের আদেশে তার সেনাপতি মির বাঁকি খাঁ মন্দির ধ্বংস করে ওই স্থানে মসজিদের ধাঁচা নির্মাণ করে।

(২) বাংলাদেশের ঐতিহাসিক এবং গবেষিকা নুসরত জাহান সায়নাসিদ্দিকা তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'ইসলামি শান্তি ও বিধর্মী সংহার' বইতে লিখেছেন, 'সম্রাট বাবরের নাম সবারই জানা। তার আদেশে বাঁকি খাঁ অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করে তাকে ১,৭৪,০০০ হিন্দুর রক্তরঞ্জিত চুনবালির প্লাস্টার করে বাবরি মসজিদে রূপান্তরিত করে'।

(৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'অন্যান্য মুসলমান হানাদারদের মতো বাবরও হিন্দু-মন্দির ও হিন্দু-বিগ্রহ ধ্বংস করার মতো বহু স্বাক্ষর রেখে গেছে। বাবর সম্বল ও চান্দেরীর মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করে। বাবরের আদেশে তার সেনাপতি মীর বাঁকি অযোধ্যার রামজন্মভূমি ভেঙ্গে তাতে প্রায় এক লক্ষ হিন্দুর রক্ত চুন বালিতে মিশ্রিত করে ইট গেঁথে বাবরের নামে মসজিদ নির্মাণ করেছে। এছাড়া গোয়ালিয়ারের নিকটে উভর জৈন মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করেছে (R.C. Mojumdar BVB VII-307)।

৪। এই মন্দির পুনরুদ্ধারকল্পে হিন্দুরা ৭৭ বার মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শিখ গুরুরাও অসীম সাহসের সঙ্গে ওইসব যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। হিন্দুদের রক্তে সরযূনদীর জল লাল হয়ে যায়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Christopha Jofferlat -এর বই The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics 1925 to 1990 (Penguine Books) দ্রষ্টব্য।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

পরমহংস নয় হংস

অভিমন্যু গুহ লিখেছেন— 'দিদি হলো গিয়ে পরমহংসের মতো। দুধটুকু খান, জলটুকু ফেলে যান (রম্যরচনা, ৫.১২.১৬)। পরমহংস নয়, কথাটি হবে 'হংস'। প্রাসঙ্গিক চাণক্য শ্লোকটি হলো—

''অনন্ত শাস্ত্রং বহুলাশ্চ বিদ্যাঃ, অল্পশ্চ কালো বহুবিঘ্নতা চ।
যৎসারভূতং তদুপাসনীয়ং, হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ।।''

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

জল নিয়ে সংঘাত

গোপীনাথ দে

সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার কথা; ঠাকুরমার মুখে শুনেছি গ্রামে তখন একটি বড় পুকুর ছিল। ওই পুকুরের জলে কেউ নামত না। গবাদি পশুও না; কেউ শৌচকর্মও করত না। চারিদিকে উঁচু পাড় এবং চারিদিকে চারটি ঘাট ছিল। ঘাটের শেষ প্রান্তে জলের উপরে বাঁশের মাচা ছিল। ওই মাচার কিনারা থেকে বাড়ির মহিলারা বালতি, কলসি দিয়ে জল তুলে নিয়ে যেত। ওই জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার হোত। পুকুরটির নাম পদ্মপুকুর। বর্ধমানের মহারাজা নাকি ওই পুকুর খনন করে দিয়েছিলেন। তিন-চারটি গ্রামের মানুষের পানীয় জলের উৎস ছিল এই পুকুর।

তখনও গ্রামে টিউবওয়েলের চল হয়নি। পঞ্চায়েত নয়, ইউনিয়ন বোর্ড ওই পুকুরের তত্ত্বাবধান করত। যাদের সামর্থ্য ছিল তারা বাড়িতে পানীয় জলের জন্য ইঁদারা বা পাতকুয়া তৈরি করে পানীয় জলের সুরাহা করে নিত।

তারপর গঙ্গা, দামোদর দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। গ্রামে এসেছে টিউবওয়েল। তা কেবলমাত্র পানীয়জলের জন্য ব্যবহার হোত। ইউনিয়ন বোর্ড টিউবওয়েল বসাত। পনেরো-কুড়িটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হোত এক একটি ইউনিয়ন বোর্ড। যে ইউনিয়ন বোর্ড যত বেশি টিউবওয়েল বাসাতে পারত সে তত বেশি কাজ করেছে বলা হোত। তখন টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিকের সমস্যা ছিল না। কারণ তখন ভূনিম্নস্থ জলের ব্যবহার কেবলমাত্র পানীয় হিসেবেই ব্যবহার হোত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে। সেচের জন্য বিপুল জলের প্রয়োজন এবং সেই কারণে ভূনিম্নস্থ জলের ভাণ্ডারে হাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্সেনিকের সমস্যাও এসেছে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাত লক্ষ পুকুর, ডোবা বা জলাশয় আছে। ওইসব জলাশয় পরিকল্পিত ভাবে সংস্কার করলে বা জল ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করলে সেচের অনেকটা সুবিধা হতে পারত; সে সুযোগও এসেছিল একশো দিনের কাজের মাধ্যমে। কিন্তু একশো দিনের কাজে সেরকম কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা প্রকল্প নেই বা হচ্ছে না। তাই সেচের জন্য কৃষকরা বাধ্য হয়েই ভূনিম্নস্থ জলের উপর নির্ভর করছে। ফলে মাটির নীচের জলের স্তর নামছে; জলে আর্সেনিক বাড়ছে এবং দেশটা ক্রমে মরুভূমি হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করে জমিতে মাত্র একবার ফসল ফলতে পারে কিন্তু খাদ্যের জোগান বৃদ্ধির জন্য এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধির জন্য জমিকে দুই বা তিন ফসলের উপযোগী করতে ভূনিম্নস্থ জলের প্রয়োজন হচ্ছে বা নদীর জলের প্রয়োজন হচ্ছে। অবশ্যই নদীর জল সেচের জল হিসাবে একটা প্রধান উৎস। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে একটা নদী একটা দেশে সীমাবদ্ধ না থেকে একাধিক দেশে উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। সেই কারণে একটা দেশ যখন ওই নদীর উপর বাঁধ দিয়ে জল ব্যবহারের ব্যবস্থা করে তখন অন্য দেশ যার উপর দিয়ে ওই নদীর অবশিষ্ট অংশ প্রবাহিত তারা আপত্তি তোলে। যেমন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গা ও তিস্তা নদীর জলবণ্টন চুক্তি হলেও বাকিগুলি এখনও হয়নি। ভারতের এমন সাতান্নটি নদী বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কিন্তু মাত্র দুটি গঙ্গা ও তিস্তা নিয়ে চুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশ চায় আরো চুয়ান্নটি নদীর জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিয়ম অনুযায়ী আন্তর্জাতিক নদীগুলির জল প্রতিটি দেশে নদীর দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ব্যবহার করতে পারবে। অর্থাৎ, ভারতে গঙ্গার দৈর্ঘ্য বেশি, বাংলাদেশে কম। সুতরাং গঙ্গার জলে ভারত বেশি ব্যবহার করবে।

আন্তর্জাতিক স্তরে এই সব ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ ২ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক জলাভূমি দিবস ও ২২ মার্চ জলদিবস পালনের জন্য নির্ধারিত করেছে।

জল নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাত অনিবার্য বলে মনে করছে অনেকেই। অনেকের মতে নদীর জলের জোগান যত কমছে এবং তা নিয়ে দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ যত বাড়ছে ততই তারা সামরিক সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি বিশ্বে মোট জলের মাত্র তিন শতাংশ মিষ্টি জল; অর্থাৎ মানুষের ব্যবহারযোগ্য জল।

বিশ্বের বড় বড় নদীগুলির মধ্যে প্রায় ২৯টি নদী একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। এই ভাবে ওইসব নদী যেসব দেশকে জল সরবরাহ করে তার সংখ্যা প্রায় ১১৫টি। কিন্তু জলের চাহিদা অনুসারে যেহেতু জোগান কম তাই অসন্তোষ বাড়ছে। আর সেই কারণেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন আগামীদিনে হয়তো জলের জন্যই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। তবে বিজ্ঞানীরা আশার কথা শুনিয়েছেন, তাঁরা নাকি নিকট ভবিষ্যতেই সমুদ্রের নোনা জলকে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে ফেলতে পারবেন। আর তা যদি পারেন তবে একটা কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান তাঁরা করে ফেলবেন। ■

পূর্ণচন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

রসিক গৌরাঙ্গ দাস

বাংলার এক হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়— এই বাংলায় শুধু সোনার ফসলই ফলেনি, অজস্র সোনার প্রতিভারও স্ফুরণ ঘটেছে। সেই জ্যোতির্ময় আশ্চর্য সব প্রতিভার মধ্যে 'নদের নিমাই' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন মধ্যমণি।

এহেন প্রেমের অবতার এই বাংলাদেশের উর্বর মাটিতেই সম্ভব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে মনীষা এবং হৃদয়বৃত্তির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই বলেছিলেন—

'বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া।'

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপের মায়াপুর গ্রামে শুভ দোলপূর্ণিমাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন 'নদের নিমাই'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু। অহৈতুকী প্রেমভক্তি আন্দোলনের পরাকাষ্ঠা। ভগবান হয়েও তিনি এই ধরাধামে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। অবতরণের প্রধান কারণ— প্রথমত, তিনি শ্রীরাধার প্রেমের মাধুর্য এবং স্বরূপ আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং শ্রীকৃষ্ণের পুজোর পুনরায় প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কলিযুগের উপযোগী করে ভগবানের নাম ও প্রেম প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কারণ কলিযুগের মানুষ এমনিতে স্বল্পায়ু এবং জীবনযুদ্ধে অতিশয় ব্যস্ত। তাদের পক্ষে জটিল পূজার্চনা বা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ভগবান আত্মারাম হয়েও 'স্বমাধুর্য' আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে? যাঁর কৃপালাভের জন্য সারা বিশ্ব পাগল, যাঁর সুধামৃত পানে আপামর জনসাধারণ পরিতৃপ্ত। যাঁকে দর্শন করলে শুদ্ধভক্তির উদয় হয়, যাঁকে স্পর্শ করলে জীবনে শাশ্বত শক্তির সঞ্চার হয়, যাঁর সান্নিধ্যে এলে লজ্জা-ঘৃণা-ভয় দূরীভূত হয়। যিনি ভক্তদের কৃপা করতে সর্বদা উৎসুক, যিনি ইহলোকের আশ্রয়, পরলোকের প্রাণের আশ্বাস, যিনি ভীতচিত্তের সর্বস্ব; যিনি অপূর্ণের পূর্ণ— শূন্যের ষোল আনা, যিনি পরম পিতা, পরম মাতা, যিনি সুখের প্রভাত, আবার দুঃখরাত্রির অবসান, যাঁর কণ্ঠস্বরে দিব্য লীলার সুর ঝঙ্কৃত, যিনি সর্বদা দিব্য কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন, তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন ধর্মের নামে হিংসা অধর্ম। যাঁর অলৌকিক প্রভাবে জগাই মাধাইয়ের মতো শত শত ঘোর মদ্যপও মনুষ্যত্বের মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। অহিংসা-সাম্যবাদী আন্দোলনই যে সমস্যা সমাধানের রাস্তা এই সত্য ধর্মীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম দেখা গেল। শত সহস্র মানুষ তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে ত্যাগ, প্রেম ও অহিংসার আদর্শে অনুপ্রাণিত হলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির অপূর্ণতায় ব্যথিত হয়ে বলেছেন— 'আমাদের মধ্যে হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি বিস্মৃত মানব প্রেমের বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— 'যেখানে একবিন্দু যথার্থ ভক্তি দৃষ্টিগোচর হইবে সেখানেই বুঝিতে হইবে যে উহা নদীয়া কেশরী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম প্রণয়ের মহাত্ম্য কণিকা।'

চিত্তরঞ্জন দাস বলেছেন— 'আমার জীবনে পরিবর্তন এনেছেন শ্রীগৌরাঙ্গদেব। শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মহারা প্রেমমূর্তি আমার সব কুসংস্কার, সব দোষ দূর করে দিয়েছে ও দিচ্ছে।'

কবি নজরুল ইসলামের কবিতার কিছু অংশ—

'বনচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়
তোরা দেখবি যদি আয়।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি আন্দোলন এবং ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণের দ্বারা সকলে প্রভাবিত হয়েছিল। যেমন, তৎকালীন বাংলার শাসনকর্তা সুলতান হোসেন শাহের দুই মন্ত্রী— সাকর মল্লিক (প্রধানমন্ত্রী) এবং দবির খাস (অর্থমন্ত্রী) পরবর্তীকালে সনাতন এবং রূপ গোস্বামী। প্রবোধানন্দ সরস্বতী, বল্লভাচার্য, গোপাল ভট্ট এবং পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র, এমনকী তৎকালীন ভারত-বাদশা আকবরও তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বলেছেন—

'ঐছন পহুঁকো যাই বলিহারি।
শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত প্রেমের ফলস্বরূপ মানুষ ফিরে পেল মনুষ্যত্বের মর্যাদা, পেল মুক্তির স্বাদ, শুচি হলো মুচি, যবন হলো নামাচার্য, উঁচু-নীচু বিভেদভাব, বৃথা অভিলাষ, হিংসা-দ্বেষ হলো দূরীভূত।

বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব কল্যাণে আজও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান চিরভাস্বর। শুভ আবির্ভাব দিবসে প্রার্থনা জানাই তিনি যেন আমাদের চৈতন্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন।

(লেখক মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির, ইন্টার ন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেসের জনসংযোগ আধিকারিক)

তামিলনাড়ুর একটি প্রাচীন পরম্পরা

জল্লিকট্টু

সুতপা বসাক ভড়

কয়েকদিন আগে হঠাৎ খবরে 'জল্লিকট্টু' একটি বিশেষ স্থান পেল। তামিলনাড়ুর বিতর্ক-বিবাদ পৌঁছে গেল সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় পর্যন্ত। এটি তামিলনাড়ুর একটি প্রাচীন খেলা— যাতে মানুষ ও ষাঁড়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। একটি বলিষ্ঠ ষাঁড়কে কুঁজ ধরে যে আটকাতে পারবে তাকে সম্মানিত করা হয়।

অভিযোগ, এতে নাকি অনেক মানুষ এবং জন্তু হতাহত হয় এবং এটি একটি নিষ্ঠুর প্রথা। একদিকে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা হঠাৎ করে জল্লিকট্টুর বিরুদ্ধে মতামত জানাতে শুরু করে দিল, অপরপক্ষে তামিল জনসাধারণ মেরিনা সমুদ্রতট এবং আরও অনেক জায়গায় জল্লিকট্টুর সমর্থনে মিছিল করতে লাগল। ওই তকমাধারী বুদ্ধিজীবীদের অতি উৎসাহ দেখে একটু সন্দেহই হয়।

আসলে জল্লিকট্টু তামিল সংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান উৎসব। এটি মকরসংক্রান্তির সময় হয়। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পুরনো একটি খেলা হলো জল্লিকট্টু। অতীতে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে গোরু, ষাঁড় উভয়েরই মাহাত্ম্য ছিল। বর্তমানে আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে আমরা ষাঁড় এবং বলদকে বাড়তি বোঝা মনে করি। ষাঁড় শিব ঠাকুরের বাহন নন্দী হিসেবেই পূজিত হয় এই দেশে। এই মানসিকতা বজায় রেখে শক্তিশালী, দুরন্ত ষাঁড়ের কুঁজ ধরে তার শিঙে বাঁধা পুটলি খুলে আনাই এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এজন্য কৃষকেরা তাদের ষাঁড় শক্তপোক্ত করে পালন পোষণ করে বড় করে তোলে। এই খেলাতে কেবলমাত্র দেশি ষাঁড়ই অংশগ্রহণ করে, কারণ তাদের পিঠে উঁচু কুঁজ থাকে। ভারতীয় প্রজাতির ষাঁড়ের এটাই বিশেষত্ব। এই কুঁজ থাকার জন্যই কৃষিকার্য, গাড়ি টানা, ঘানি টানা ইত্যাদি কাজে দেশি বলদের আবশ্যকতা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। গোরু-ষাঁড় আমাদের দেশে সর্বত্র পূজ্য, সুতরাং ষাঁড়কে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ পারম্পরিক অনুষ্ঠান যাতে কৃষকসমাজ, গ্রাম্যযুবকেরা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে তা বন্ধ করার প্রশ্ন ওঠা তো উচিতই নয়, বরং এটি উৎসাহ পাবার যোগ্য।

প্রসঙ্গত, জল্লিকট্টুর ইতিহাস নিয়ে এখানে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। তামিলনাড়ুতে জল্লিকট্টুকে (অথবা সল্লিকট্টু) এরু থাজুভুথাল এবং মনজু বিরাট্টুও বলা হয়। এটা একটি প্রাচীন তামিল প্রথা। এতে পুলিকুলাম এবং কঙ্গায়ম শ্রেণীর ষাঁড় ব্যবহৃত হয়। প্রথমেই ষাঁড়টিকে ভিড়ের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর এই খেলায় অংশগ্রহণকারী একাধিক যুবক ষাঁড়ের কুঁজটি ধরে তাকে থামাতে চেষ্টা করে। আর ষাঁড়টি বাধা অগ্রাহ্য করে পালাতে চেষ্টা করে। যে খেলোয়াড় যত বেশিক্ষণ ষাঁড়টিকে আটকে রাখতে পারবে সেই বিজয়ী ঘোষিত হবে।

প্রাচীন তামিল সাহিত্যে জল্লিকট্টুকে এরু থাজুভুথাল বলা হয়েছে, যার অর্থ ষাঁড়কে আদর করা। বর্তমান নাম জল্লিকট্টু বা সল্লিকট্টু কথাটি এসেছে সল্লি (মুদ্রা) এবং কট্টু (প্যাকেজ) এই দুটি শব্দ থেকে। বোঝাই যাচ্ছে জল্লিকট্টুর বিজয়ী খেলোয়াড়ের নগদলাভের একটি ব্যাপার আছে। তামিল ইতিহাসে যে সময় (৪০০-১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ধ্রুপদি কালপর্ব হিসেবে চিহ্নিত তখন থেকেই জল্লিকট্টু এই অঞ্চলে জনপ্রিয়। প্রাচীন তামিলভূমির মুল্লাই অঞ্চলের বাসিন্দারাই জল্লিকট্টুর উদ্ভাবক। সে যুগে বাড়ির মেয়ের জন্য সম্ভাব্য পাত্রের শক্তির

পরীক্ষা নিতে তাকে জল্লিকট্টুর মাঠে নামানো হোত। পরে তা সাধারণভাবে সাহসিকতা এবং শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। হরপ্পা সভ্যতার সিলমোহরেও জল্লিকট্টুর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

অনেকসময় দুর্ভাগ্যবশত মানুষ ও ষাঁড় হতাহত হয় এই খেলায়। কিছু চিন্তাবিদ এই দাবি তুলে এই দেশীয় খেলাটিকে আইন করে বন্ধ করার পরামর্শ দেন। এদের সঙ্গে পেটার মতো সংস্থাও সুর মেলাতে শুরু করে দেয় পশুর ওপর অত্যাচার হচ্ছে এই অজুহাতে। ব্যাস, তারপর প্রায় সবাই কিছুটা জেনে আর তার চেয়ে বেশি না জেনে জল্লিকট্টু বন্ধ করার পক্ষে মতামত দিতে শুরু করলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো ক্রীড়াতেই অসাবধানতাবশত মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে; এটি সবার কাছেই অনভিপ্রেত, কিন্তু সেজন্য কি কোনো খেলা আইন করে পৃথিবী থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? ফুটবল, ক্রিকেটের মতো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় খেলাতেও কি খেলোয়াড়ের মৃত্যুর মতো দুর্ঘটনা ঘটে না? তারপর প্যারাগ্লাইডিং, রিভার রাফটিং, বাঞ্জি জাম্পিং, স্নো-স্কেটিং-এর মতো খেলাতেও দুর্ঘটনা ঘটে— তবে কি সেই খেলাগুলি নিষিদ্ধ হয়ে গেছে? ওই বুদ্ধিজীবীরা কী বলবেন?

একবার চোখ রাখা যাক আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রিকেট খেলতে গিয়ে কতজন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের মৃত্যু হয়েছে :

(১) জেসপার ভিনাল— ২৮ আগস্ট ১৬২৪ সালে কেনসে মাথায় বল লেগে মৃত্যু হয়।

(২) জর্জ সামারস— ২৯ জুন ১৮৭০ সালে নটিংহামে মাথায় বল লেগে মৃত্যু হয়।

(৩) অ্যান্ডি ডুকাট— ২৩ জুলাই ১৯৪২ সালে লন্ডনে মাঠের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়।

(৪) আবদুল আজিজ— ১৭ জানুয়ারি ১৯৫৯ সালে করাচিতে বুকে বল লেগে মৃত্যু হয়।

(৫) উইলফ ম্ল্যাক— ১৫ জানুয়ারি ১৯৮৯ সালে বানজুলে ব্যাট করার সময় হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে মৃত্যু হয়।

(৬) ইয়ান ফলি— ৩০ আগস্ট ১৯৯৩ সালে হোয়াইটহেভেনে খেলার সময় চোখে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে যাবার পর হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

(৭) রমন লাম্বা— ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালে ঢাকাতে মাথায় বল লেগে মৃত্যু হয়।

(৮) ওয়াসিম রাজা— ২৩ আগস্ট ২০০৬ বাকিংহামশায়ার-এ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

(৯) ডেরেন র‍্যান্ডাল— ২৭ অক্টোবর ২০১৩ সালে অ্যালিস-এ মাথায় বল লেগে মৃত্যু হয়।

(১০) ফিলিপ হিউজেস— ২৭ নভেম্বর ২০১৪ সালে সিডনি-তে ঘাড়ে বল লেগে মৃত্যু হয়।

(১১) রেমন্ড ভ্যান স্কুর ২০ নভেম্বর ২০১৫ উইন্ডহোক-এ স্ট্রোক হয়ে মারা যান।

আর পেটার কাছে জানতে চাই ক্রীসমাসে প্রায় সব খ্রিস্টান পরিবারেই টার্কি খাওয়ার চল আছে আর ইদে মুসলমানরা কত যে জানোয়ার হত্যা করে তার ঠিক ঠিকানা নেই, তখন তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন কেন? সেসব ক্ষেত্রে পশুর ওপর অত্যাচার তাঁদের চোখে পড়ে না কেন? বকরিদ-এর দিন বাংলাদেশের ঢাকার রাজপথে গো-রক্তে লাল হয়ে যাওয়ার দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে তাঁরা কি দেখেননি? একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে জল্লিকট্টু বন্ধ করার জন্য যে দুরভিসন্ধি শুরু হয়েছিল তার পেছনে ছিল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে বিদেশি শক্তিগুলির অর্থনৈতিক মুনাফা করার অসদুদ্দেশ্য। ভারতে গোবংশ (গোরু- বলদ-ষাঁড়) কৃষিকার্যের ভিত্তি। কৃষিপ্রধান দেশে বলদ/ষাঁড় জমিতে লাঙ্গল দেওয়াতে সাহায্য করে। জমিতে ফসল হলে সেই ফসল বলদের গাড়ি করে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়ার চল ছিল এবং এখনও অনেক জায়গায় আছে। গ্রামে গোরুর গাড়ি এখনও যাতায়াতের একটি মাধ্যম। তেল বের করার জন্য কলুর দরকার পরে বলদের। গোবর সার কৃষিকাজের সহায়ক হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়া গোবর থেকে তৈরি ঘুঁটে জ্বালানি হিসেবে বা গ্রামে মশা তাড়ানোর কাজে ব্যবহার হয়। সুতরাং, পারম্পরিক প্রথায় চাষ করে এমন কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে গোরু-বলদ-ষাঁড় সবই অত্যাবশ্যক। এখন বিদেশি ট্রাক্টর কোম্পানি, সার কোম্পানিগুলির নজর পড়েছে কৃষকদের ওপর। কৃষকদের তারা তাদের পণ্যের উপভোক্তা বানাতে চাইছে। ফলে তারা ষাঁড় এবং বলদের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্বকে যেভাবেই হোক শেষ করে দিতে চাইছে, যাতে তারা তাদের বাণিজ্যিক পণ্যের বাজার হিসেবে ভারতের বেশিরভাগ কৃষককে পেয়ে যায়। অথচ দেশি ষাঁড়ের কুঁজ থাকার জন্য তা কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনে বেশি ব্যবহার হয়; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশি ষাঁড়ের কুঁজ থাকে না। যাঁরাই সম্পূর্ণ বিদেশি ধারার পদ্ধতিতে কৃষিকাজ বা পশুপালন করছেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং পরিবেশ দূষণের ভাগীদার হচ্ছেন। সেজন্য ভারতের কিছু উন্নতমনস্ক কৃষি বৈজ্ঞানিকরা ট্রাক্টরের পরিবর্তে জমিতে লাঙলের ব্যবহারকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন— এতে জমির উর্বরতা দীর্ঘদিন বজায় থাকে; রাসায়নিক সারের তুলনায় গোবর সার উর্বর, কীটনাশক হিসেবেও কাজ করে এবং মাটির জলধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি করে। সেজন্য দেশি গো-বংশ রক্ষার জন্য যখন কিছু বিজ্ঞানী অক্লান্ত চেষ্টা করছেন, তখন বিদেশি কোম্পানিগুলি পেটার মতো সংস্থাকে ব্যবহার করে আমাদের প্রাচীন এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি পারম্পরিক ক্রীড়াকে বন্ধ করে আমাদের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উভয়দিক থেকে আঘাত করতে চাইছে। এক্ষেত্রে আমাদের একটু সচেতন হতে হবে। না জেনে শুনে মন্তব্য না করে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে দেশীয় এই খেলার সমর্থন করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাছাড়া তামিলনাড়ুর সংস্কৃতি, জীবনযাপন খুবই উন্নতমানের। সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ এই পারম্পরিক খেলাকে সমর্থন করে। পারম্পরিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই জল্লিকট্টুকে সমর্থন করা কেবলমাত্র তামিলনাড়ুর নয় সমগ্র দেশবাসীর কর্তব্য।

দুঃসাহসী কানু

শ্রীকৃষ্ণের ছোটবেলার নাম কানাই। সবাই ডাকে কানু বলে। নন্দ রাজার ছেলে কানু। সকালবেলা বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে সে গোচারণে যায়। ফেরে সেই সন্ধ্যেবেলা। মাঠে গিয়ে তারা গোরুগুলি ছেড়ে দেয় তারপর খেলাধুলা করে। একেকদিন একেকরকম খেলা। রাজা রাজা খেলা হলে কানু রাজা সাজে। কারণ, সে বন্ধুদের খুব প্রিয়। কখনওবা কানু বাঁশি বাজায়। সবাই মোহিত হয়ে শোনে সেই বাঁশি। এমনকী গাভীরাও ছুটে আসে সেই বাঁশির ধ্বনি শুনে। কোনোদিন যদি কানু গোচারণে না আসে তাহলে বন্ধুদের মন খারাপ হয়ে যায়। খেলা জমে না।

এমনি একদিন কানু দেরি করে গোচারণে এলো। এসে দেখে বন্ধুরা কেউ খেলছে না। কেমন যেন মনমরা হয়ে রয়েছে। কারো চোখে জল। কানু বলল— কী হয়েছে? বন্ধু সুবল বলল— সর্বনাশ হয়ে গেছে। তুই আসিসনি, আমাদের শ্যামলী আর নেই।

শ্যামলী হলো একটি সুলক্ষণা গাভী। সুবলের খুব প্রিয়। সেই গাভী কালিদহে জল খেতে গেছিল। জলে মুখ দিতেই কালিদহের প্রকাণ্ড কালিয়নাগ তাকে টেনে নিয়ে যায়। কালিদহের সেই সাপের কথা অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। বিশাল আকারের সেই সাপ। বন্ধুরা সবাই সেই সাপের বর্ণনা দিচ্ছিল। সাপটির বড় বড় দাঁত, বিশাল আকারের অনেকগুলি ফণা। সাপটি যবে থেকে কালিদহে এসেছে তবে থেকে জল বিষ হয়ে গেছে। পশুরা তৃষ্ণায় জল খেতে যায়, কিন্তু জলে মুখ দিতেই তাদের মৃত্যু হয়। এমনকী জলের উপর দিয়ে কোনো পাখি উড়ে

গেলেও মরে যায়। কানু কোমরে গামছা বেঁধে নিল। বলল— চল দেখি, কোথায় সেই কালিয়নাগ। আমি আজ তাকে মারবো। বন্ধুরা হা হা করে উঠলো। বললো— সেটি সাপ নয় রে, যেন দৈত্য! মানুষ কখনো তার সঙ্গে লড়াই করতে পারে? সাপটির বিষে মানুষ মরে যায়। কিন্তু কানু কারো কথা শুনবে না। বন্ধুরাও পারে না কানুর অবাধ্য হতে। তখন সবাই মিলে কালিদহের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সুবল তখনো কাঁদছে। কানু লাফ দিয়ে জলে নেমে গেল। বন্ধুরা সবাই ভয়ে চিৎকার করতে লাগলো। কেউ ছুটলো গ্রামে খবর দিতে। কানু কালিদহে নেমেছে শুনে গ্রামের সবাই ছুটে এলো। সবাই ভাবছে সাপের বিষে কানু আর বেঁচে ফিরতে পারবে না। অনেকক্ষণ জলে কোনো সাড়াশব্দ নেই। সবাই হা-হুতাশ করছে।

সেই সময়ই কালিদহের জলে তোলপাড় শুরু হলো। কানু জলের উপর লাফিয়ে উঠলো। সঙ্গে ফণা তুলে উঠলো সেই বিষধর সাপ। বিশাল সে ফণা। যে মেয়েরা ছুটে এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞান হয়ে গেল। জলে তখন তোলপাড় চলছে। কিছু পরে কানু সাপের ফণায় লাফিয়ে উঠলো। কানু আর সাপের লড়াই। অনেক্ষণ ধরে চলল সেই লড়াই। কানু সাপের ফণায় পা দিয়ে আঘাত করে চলেছে। এক সময় কালিদহের জলে রক্তের আভা দেখা গেল। সাপটি যেন নেতিয়ে পড়েছে। কানু তখনো ক্রমাগত আঘাত করতে লাগলো সাপটিকে। কানুর পায়েও রক্ত। শেষ পর্যন্ত কানুর কাছে সাপটি হার মানলো। বিশাল বিশাল ফণা সমেত সাপটির আছাড়ে পড়লো কালিদহের জলে। কালিয়নাগ কানুকে কথা দিল সে কালিয়দহ ছেড়ে চলে যাবে। কানু জল থেকে উঠে এলো। গ্রামের সবাই ছুটে এসে ঘিরে ধরলো কানুকে। কেউ গা ধুয়ে দেয়, কেউ গা মুছে দেয়। কানু সেদিন যেন সত্যিই সবার রাজা হয়ে গেল।

ভারতের পথে পথে

মৈরাং

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরের মেঘালয়ের একটি শহর মৈরাং। ১৯৪৪ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ মণিপুরে স্বাধীন সরকার গঠন করে। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মাটিতে মৈরাং-এ প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। বর্তমানে এটি একটি প্রসিদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র। আই এন এ মিউজিয়াম, লেকটাক হ্রদ, ছোটবড় নানা জলপ্রপাত ছাড়াও এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকর্ষিত করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিখ্যাত কেইবুল লামজো ন্যাশনাল পার্ক এখানেই অবস্থিত। তবে নেতাজীর স্মৃতিধন্য মৈরাং সবচেয়ে বেশি পরিচিত ১৯৪৪ সালের সেই ঐতিহাসিক স্বাক্ষর বহন করার জন্য।

এসো সংস্কৃত শিখি

स्वयमेव करोति किम् ?
নিজেই করছেন কি?
तत् मह्यं न रोचते।
ওটা আমার পছন্দের নয়।
उक्तम् एव रठति सः।
বলাটাই সে মুখস্থ করছে।
उन्यथा बहु कष्टम्।
না হলে খুব কষ্ট আছে।
किमर्थं पुर्वं न उक्तवान् ?
আগে কেন বলেননি?

ভালো কথা

আমার দেখা বইমেলা

পাঁচ বছর বয়সে আমি প্রথম বাবার সঙ্গে বইমেলায় যাই। সেবার গুটিকতক কার্টুন ও আঁকার বই নিয়ে ফিরে আসি। তখনই আমি বইয়ের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করি। দু-বছর বাদে এবছর আবার আমি বই মেলায় গেলাম। দু'বছর ধরে একটু একটু করে ভাঁড়ে পয়সা জমিয়েছি। সেই ভাঁড় ভেঙে ৫২৬ টাকা পুঁজি নিয়ে রওনা হই বইমেলায়। বাবার সঙ্গে এক স্টল থেকে অন্য স্টলে ঘুরে বেড়াই। পছন্দমতো দুটো বই কিনি। নামকরা অনেক লেখককে নিজের চোখে দেখলাম। বই মানুষের বন্ধু। সেই বন্ধুর টানে বহু মানুষ হাজির হয়েছে বইমেলায়। ছোট বড় এমনকী বয়স্করাও।

অর্ঘ্যদীপ আঢ্য, তৃতীয় শ্রেণী, তারক প্রামাণিক রোড, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) হা কা র বি	(১) ন যো স গা
(২) তু ন নি ন	(২) র পা পা রা

২৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) স্বর্ণালঙ্কার (২) কর্ণকুহর

২৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) পাতালপুরী (২) ঘৃতকুমারী

উত্তরদাতার নাম

(১) ঋকদীপ কর্মকার, কালিয়াচক, মালদা (২) প্রীতম মণ্ডল, সিউড়ী, বীরভূম (৩) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা (৪) শুভম দে, রেণীরোড, পুরুলিয়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

নারীশক্তি জাগরণে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি

অঙ্গনা

শুভশ্রী দাস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রেরণায় সৃষ্ট রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি গত ৪০ বছর ধরে ভারতীয় মহিলাদের নারীশক্তি জাগরণে কাজ করে চলেছে। ৮০ বছরের পথ চলায় সমিতি আজ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় মহিলা সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সঙ্ঘের প্রেরণায় সৃষ্ট সংগঠনের তালিকা দীর্ঘ। সেই তালিকার প্রথম নামটিই রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। মহিলাদের মধ্যে চরিত্র গঠন ও দেশভক্তি নির্মাণের কাজ সমিতি করে চলেছে। মহিলাদের মধ্যে কাজ করা ভারতীয় সমাজে একটি কঠিন কাজ। তাঁরা ঘরসংসারের কাজকেই সর্বস্ব মনে করেন। যুবতীদের প্রতি পরিবারের নানারকম বাধানিষেধ থাকে। সেজন্য সমিতির কাজ করা খুব কষ্টসাধ্য। তা সত্ত্বেও সমিতি পায়ে পায়ে ৮০ বছর পার করে ফেলেছে।

সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীবাঈ কেলকর। তিনি সেবিকাদের কাছে মৌসিজী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবনে গান্ধীজীর খুব প্রভাব ছিল। গান্ধীজীর আশ্রমে প্রার্থনাসভায় অংশ নেওয়া ও চরকা চালাতে তিনি খুব ভালো বাসতেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর মনের জিজ্ঞাসার

সেবিকাদের পথসঞ্চলন।

উত্তর খুঁজে পেতেন না। ইতিমধ্যে তাঁর বিয়ে হয়েছে। কয়েক সন্তানের মা হয়েছেন। সে সময় মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়েছে। তাঁর দুই পুত্র শাখায় যাওয়া শুরু করেছে। শাখায় কী হয় তা জানার তাঁর খুব আগ্রহ থাকায় একদিন দূর থেকে শাখা দেখে তিনি খুব প্রভাবিত হন। তারপরই তিনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্গে দেখা করে মেয়েদের মধ্যে এমন কাজ শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ডাক্তারজীর পরামর্শে তিনি মহিলাদের জন্যই আলাদাভাবে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি গঠন করেন। তখন ১৯৩৬ সাল। অনুশাসন ও চরিত্র নির্মাণের জন্য সঙ্ঘের মতোই সেবিকা সমিতি নিত্য শাখা শুরু করে। মহিলাদের মধ্যে শারীরিক ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড, ছুরি, তলোয়ার চালানোর প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

সমিতির আরাধ্যা অষ্টভুজা ভারতমাতা। ৮০ বছরের সময়কালে সমিতি নানাবিধ সেবাকাজ করেছে। বর্তমানে সমিতির ৭৫১টি সেবা প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা, আরোগ্য, সংস্কারকেন্দ্র, স্বয়ম্ভরতা গোষ্ঠী, পুস্তকালয়, স্বদেশি বস্তুভাণ্ডার উল্লেখযোগ্য। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুর্গম স্থানেও সমিতি সেবাকাজের মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাযোগ্যতা লাভ করেছে। সমিতির কাজ মানুষের কাছে বেশি করে পৌঁছনোর জন্য সেবিকা প্রকাশন, চিত্রপ্রদর্শনী, দিনদর্শিকা, অডিয়ো ভিসিডি, পাওয়ার পয়েন্ট প্রোজেকশন নির্মাণ করা হয়েছে। সমিতির কাজ আজ দেশের সীমা ছাড়িয়ে ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা-সহ ১০টি দেশে সক্রিয় রয়েছে। সেখানেও তারা নানাবিধ সেবাকাজ করে চলেছে।

সমিতির মতাদর্শ ও তার অপূর্ব কার্যপদ্ধতি অন্য মহিলা সংগঠনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী প্রতিষ্ঠাকালেই স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ার কারণে মহিলাদের পরিবার নির্মাণ ও রাষ্ট্র নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একজন মহিলা সংস্কারিত হওয়ার অর্থ পুরো পরিবার সংস্কারিত হওয়া। বাকি মহিলা সংগঠন তাদের অধিকার ও প্রতিষ্ঠা বিষয়েই সজাগ; কর্তব্য পালনে সেরকম নয়। সমিতি নারীসমাজকে জাগ্রত করে তাদের অন্তর্নিহিত রাষ্ট্র নির্মাণের ক্ষমতা বিকশিত করে।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও সমিতি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনে সমিতির অংশগ্রহণ প্রবীণরা জানেন। তাছাড়া যখন যখন দেশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তখন পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে সেবাকাজে সমিতি অংশগ্রহণ করেছে। জম্মু-কাশ্মীরের ঘরছাড়া হিন্দুদের পাশে থাকার কথা সারাদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। ১৯৬৫ ও ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় সেবিকারা সীমান্তে পৌঁছে সৈনিকদের মনোবল বাড়ানোর কাজ করেছে। '৭১-এর যুদ্ধে আহত সৈনিকভাইদের রক্ত দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসা সেবিকাদের কথা আজও মালদার মানুষ স্মরণ করেন।

সঙ্ঘের মতো সমিতিও ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। তাই প্রতিষ্ঠাত্রীর প্রয়াণের পরও কাজ বেড়ে চলেছে। বাংলায় সমিতির কাজ শুরু হয় মহারাষ্ট্রের মেয়ে কলকাতায় বিয়ে হয়ে আসা বসন্তরাও বাপটের প্রয়াত স্ত্রী বাসন্তী বাপটের হাত দিয়ে। আজ বাংলার সমস্ত জেলার সমিতির কাজ চলেছে। বাসন্তী বাপটের পর কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন কলকাতার শ্রীমতী মহুয়া ধর, শ্রীমতী মায়া মিত্র, মালদার শ্রীমতী বন্দনা রায়, সুজাতা মিত্র, রীতা চক্রবর্তী, রায়গঞ্জের মুক্তিদি, জয়াদি, শিলিগুড়ির রীণাদি, পুতুলদি প্রমুখ। দেশের নারী সমাজের জন্য নিঃস্বার্থ কাজ করছে সমিতি, কিন্তু পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের অতিব্যস্ততা তাঁদের এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অবশ্য চ্যালেঞ্জকে সহজভাবে গ্রহণ করাই শক্তিরূপা নারী জাতির বৈশিষ্ট্য।

স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফল বলে দিচ্ছে বিজেপিই ভারতের প্রধান জাতীয় দল

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

কোনো একটি নির্বাচনে একজন প্রার্থী বা একটি দলের পক্ষে জোটানো সমর্থনের হিসেব-নিকেশ সেই অর্থে গাণিতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু তার চেয়ে কোনো একজন ব্যক্তি বা একটি সম্প্রদায় বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট কোনো দলের পক্ষে কী বিষয় মাথায় রেখে ভোট দান করল সেটি জানা জরুরি শুধু নয় অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিংও বটে। প্রত্যেকটি ভোটের একটি নির্দিষ্ট অর্থ বা দ্যোতনা আছে যার সঙ্গে জড়িত থাকে ভোটদাতার নানা ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা আবেগজনিত অভিব্যক্তি। সেই কারণে রাজনৈতিক অনুভবের আন্দাজ লাগানোর পন্থাগুলিও একমাত্রিক নয় বরং বিভিন্ন।

মহারাষ্ট্রের নগর নিগমগুলির (১০টি) সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপির চোখ ঝলসানো সাফল্য ও প্রায় একই সময়ে ওড়িশার পঞ্চায়েত নির্বাচনে এযাবৎ দাঁত ফোটাতে না পারা বিজেপির বিপুল অগ্রগতি এই ধরনের আলোচনাকে আবশ্যিক করে তুলেছে। একটি বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও রীতি অনুযায়ী পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলি মূলত স্থানীয় সমস্যাকে ঘিরেই অনুষ্ঠিত হয়। একথা কিন্তু সদা সত্য নয়। আজকের ভারতে ভোটদাতাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের হার বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সহায়তায় মানুষের কাছে যে-কোনো তথ্য ও সংবাদই অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কল্যাণে নির্বাচনে স্থানীয়, প্রাদেশিক বা জাতীয় এই ধরনের নির্দিষ্ট বিভাজন রেখাগুলি আর তেমন স্পষ্ট নয়। আর এরা দেশের পরিস্থিতি বিশেষে একে অপরের সঙ্গে জায়গা বদল করে নিচ্ছে (যেমন দেশব্যাপী কোনো নির্দিষ্ট নেতা বা দলের জনপ্রিয়তার বৃদ্ধি বা ঘাটতি দেখা দিলে যদি একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় নির্বাচন ও রাজ্য নির্বাচন হয় সেক্ষেত্রে একই দলের উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য বা ব্যর্থতা দেখা যেতে পারে)। অবশ্যই, এই ধরনের বাঁধাধরা কোনো গৎ নেই। কিন্তু ভারতীয় ভোটারদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিণত বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ দেখা যায় যখন তারা সমস্যাগুলির চরিত্রগত গুরুত্ব অনায়াসে আন্দাজ করে নিয়ে ও তার আশু সমাধান কোন দলের দ্বারা হতে পারে তার লক্ষ্যে অবলীলায় এক দল থেকে আর এক দলে নিজেদের সরিয়ে নেয়। সোজা কথায় বলতে গেলে, প্রাজ্ঞ ভোট পণ্ডিতরা এখন বুঝতে পারছেন ভোটদাতাদের ব্যবহারের নির্ভুল অনুমান করার কোনো নির্ধারিত ফর্মুলা এখন আর কার্যকর নয়। প্রত্যেকটি নির্বাচনই এখন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে।

নির্বাচনগুলির নিজস্ব একটি করে যুক্তিশৃঙ্খলা অবশ্যই থাকে। মহারাষ্ট্রের চরিত্রগতভাবে ভিন্ন নানান মেট্রোপলিটন বৈশিষ্ট্যে ভরপুর বিচিত্র শহরগুলিতে বিজেপির বিপুল জয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি যুক্তিশৃঙ্খলা আছে। কিন্তু আগে বলা স্থানীয় ইস্যুগুলির পুরনির্বাচনে প্রাধান্য পাওয়ার যুক্তি নাগপুর, সোলাপুর বা পুনেতে একই ভাবে কাজ করেছিল (অর্থাৎ এই শহরগুলির সমস্যা একইরকম ছিল) একথা মেনে নেওয়া কঠিন। একদিকে, অবাক হয়ে ভাবতে হয় বিজেপি ও শিবসেনা তাদের পুরনো জোট ভেঙে আলাদা লড়লেও দু'দলেরই আসন সংখ্যা (বিজেপির প্রায় তিনগুণ ৩১ থেকে ৮৪) বাড়ল অথচ ত্রিকোণ মোকাবিলায় যার অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে সহজ হিসেবে সিট বাড়িয়ে নেওয়ার কথা সেই কংগ্রেস হতাশায় ডুবে গেল। ব্যাপক আসন কমে গেল।

অন্যদিকে, নবীন পট্টনায়কের বিজেডি যারা ১৯৯৯ থেকে লাগাতার তাদের শক্তি বাড়িয়ে চলেছিল তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেল। এখানেও লাভ কুড়লো বিজেপি।

> তিনি এমন একজন নেতা যিনি দেশের স্বার্থে কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা নন। তাঁর মেয়াদের মাঝরাস্তায় পৌঁছনোর পর ভারতবাসী নরেন্দ্র মোদী নামের এই প্রধানমন্ত্রীর ওপর যে বিশ্বাস শুরুতে ন্যস্ত করেছিল তা থেকে সরে আসতে রাজি নয়। তাঁর নেতৃত্বের ওপর দেশবাসীর আস্থা আজও অটুট।

ফঃ ৪

দল সমগ্র পশ্চিম ওড়িশায় ব্যাপক দাপট দেখিয়ে কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী দলের তকমা কেড়ে নিয়েছে। এই সমস্ত নির্বাচনীক্ষেত্রে কংগ্রেস তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে অন্তর্লীন অসন্তোষের ভাবনা হয়তো ভোটারদের মধ্যে চোরাস্রোতের মতো কাজ করেছিল। কিন্তু নির্বাচনী অভিজ্ঞতা ও পণ্ডিতদের বিশ্লেষণ দেখিয়েছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ফলে বরাবর প্রধান বিরোধীদলই তার ফয়দা তোলে। সেই নিরিখে ওড়িশায় প্রধান বিরোধীদল হিসেবে কংগ্রেস সুবিধে করতে তো পারেইনি অধিকাংশ আসনে তারা পরাজিত হয়েছে। সেই জায়গা দখল করেছে বিজেপি। অথচ ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে নবীন পট্টনায়ক তার দলের সঙ্গে বিজেপি'র জোট ভেঙে দেন। ওড়িশার সমুদ্র তীরবর্তী যে অঞ্চলগুলিতে বিজেপির শক্তি অকিঞ্চিৎকর ছিল সেখানেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাজনিত পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারায় কোনো সাফল্য পায়নি, বিজেডিই বহাল রয়ে গেছে।

মহারাষ্ট্র ও ওড়িশার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দু'টি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। প্রথমটি হলো কংগ্রেস দলের সামগ্রিক অবক্ষয়। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ মহারাষ্ট্র। যে রাজ্যটি তাদের বরাবরের একটি ঘাঁটি বলে পরিচিত শুধু নয়, এই সেদিন অর্থাৎ ২০১৪ অবধি সেখানে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কংগ্রেস বারবার প্রমাণ করছে যে তারা ক্ষমতা ধরে রাখতেও অক্ষম আবার বিরোধী দল হিসেবে শক্তি বাড়াতেও ব্যর্থ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন পঞ্জাব বিধানসভার নির্বাচনে যেখানে কংগ্রেস খুব আশা করছে— তারা এবার ক্ষমতা দখল করবে সেখানে যদি এই ধরনের ট্রেন্ড-এর পুনরাবৃত্তি হয় সেক্ষেত্রে দল ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাবে। তাদের দলীয় অস্তিত্ব বিপন্নতার মুখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের ওপর যে নির্দিষ্ট মালিকানাধীন নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তাও নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে।

এরপর বলব দ্বিতীয় উপসংহারটি। যেটি হলো— বিজেপি আজ দেশব্যাপী প্রধান জাতীয় দল হিসেবে নিজেকে তুলে এনেছে। অবশ্যই ২০১৪ লোকসভার নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর দিল্লি ও বিহারে দু' দুটি পরাজয় ঘটলেও দলের সাংগঠনিক ভিত্তি অনেক বেশি গভীর হয়েছে। একই সঙ্গে আজকের বিজেপি প্রমাণ দাখিল করে বলতে পারে তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত নিষ্কলঙ্ক ভাবমূর্তির ফলে দেশের গরিষ্ঠাংশ চিন্তাশীল শ্রেণীর পজিটিভ সমর্থনও দলের পক্ষে নিয়ে এসেছে। অবশ্যই এটি কেবলমাত্র ভাবমূর্তি নয় এর সঙ্গে যোগ হয়েছে— তাঁর ক্যারিশমা, প্রশাসনিক দক্ষতা, অমলিন রেকর্ড এবং সর্বোপরি তাঁর ওপর জনতার অটল বিশ্বাস যে তিনিই কেবল পারবেন দেশের অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে। এই ভূমিকায় তাঁর কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যিনি ওড়িশার নির্বাচনী দায়িত্বে ছিলেন তিনি জানাচ্ছেন— স্থানীয় গ্রামীণ স্তরের ফলাফলে এই সাফল্য বিমুদ্রীকরণের পক্ষে জনতার ব্যাপক অনুমোদন। অবশ্য এই বিশ্লেষণটির সঠিক মূল্যায়ন করা শক্ত। কেননা সেই অর্থে নির্বাচনী প্রচারে বিমুদ্রীকরণ সেভাবে উঠে আসেনি। তবে হ্যাঁ, বিমুদ্রীকরণের প্রভাব সম্বন্ধে বিরোধীরা যেমন ঢোল পিটিয়েছিল বা এক শ্রেণীর মিডিয়া উত্তাল হয়ে উঠেছিল সেরকম বিধ্বংসী বা টালমাটাল কিছু সত্যি সত্যিই ঘটলে নিশ্চিত বিজেপির ওপর তার প্রত্যাঘাত নেমে আসত। ফলাফল খারাপ হোত। কিন্তু হায়! নোটবন্দির পর যতগুলি স্থানীয় স্তরের নির্বাচন হয়েছে ফরিদাবাদ (হরিয়ানা), চণ্ডিগড় সমেত সবেতেই বিজেপির বিপুল জয় হয়েছে। সাম্প্রতিক উত্তর প্রদেশের নির্বাচনী প্রচারেও নোটবন্দি ধামা চাপা পড়ে উঠে এসেছে সামাজিক পরিচয় ও প্রশাসনিক সাফল্য বা ব্যর্থতার রাজনৈতিক চর্চা। বিমুদ্রীকরণ একটি বিরাট বিষয় যার অভিঘাত মাত্র ১০০ দিনে ভুলে যাওয়ার নয়। বাস্তবে মোদীর প্রশাসনিক কাজকর্মের ধারা সম্পর্কে মানুষের ধারণা তৈরির প্রক্রিয়ায় তা এক বিরাট ছাপ ফেলেছে। মানুষ পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছে এই একজন নেতা যিনি কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা নন ও দেশের হিতার্থে তিনি নিরন্তর পরিবর্তন ঘটিয়ে যাবেন। তাঁর মেয়াদের মাঝরাস্তায় পৌঁছনোর পর ভারতবাসী নরেন্দ্র মোদী নামের এই প্রধানমন্ত্রীর ওপর যে বিশ্বাস শুরুতে ন্যস্ত করেছিল তা থেকে সরে আসতে রাজি নয়। তাঁর নেতৃত্বের ওপর দেশবাসীর আস্থা সেই ২০১৪ সালের মতোই অটুট ও আরও বেশি দৃঢ়। ■

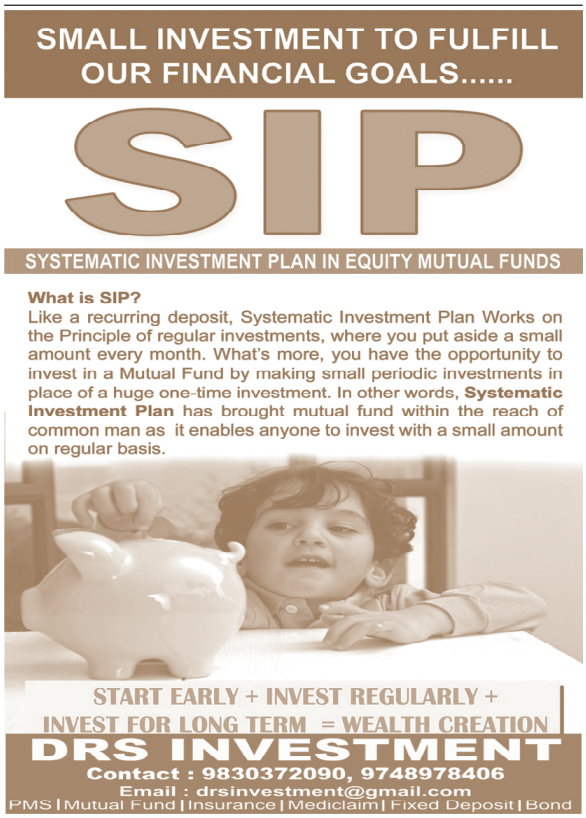

অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পগুলিতে ক্রমশ বাড়ছে হিন্দুর সংখ্যা

রাজ্যে রাজ্যে

ধর্মানন্দ দেব

২০১০ সালের ৫ এপ্রিল অসমের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে (পিএলবি ১৪৯/২০০৮/৫৪) সম্পূর্ণ অস্থায়ীরূপে শিলচরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগারে 'ডিটেনশন ক্যাম্প' স্থাপন করে। তবে 'ডিটেনশন ক্যাম্প' বলে আজ আর কোনো সাইনবোর্ড নেই। কারাগারের প্রথম ও প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ডান পাশে একটি বোর্ড সাঁটা রয়েছে আর ওই বোর্ডেই রয়েছে ভিতরের হিসেব নিকেশ। কনভিক্ট, ইউটিপি (আন্ডার ট্রায়্যাল প্রিজনারস) ইত্যাদি এবং তার সঙ্গেই হিসেব-নিকেশ রয়েছে ডিটেনশান ক্যাম্পের অর্থাৎ ফরেনার্স ট্রাইবুনালের। এককথায় বলা যায় ডিটেনশনের নাম করেই প্রেরণ করা হচ্ছে কারাগারে। ডিটেনশন ক্যাম্পের বন্দিদের কারাগারের ভিতরে চলাফেরা করতে হয় খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি-সহ নানা অপরাধের মামলায় জড়িত এবং সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের সঙ্গে। যদিও কিছুদিন থেকে ওই কারাগারের ভিতরে দুই কক্ষ বিশিষ্ট আলাদা ঘরেই ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি পুরুষদের রাখা হচ্ছে। শুধু ঘুমানো ছাড়া বাকি সবকিছু সেই আগের মতোই। আবার মহিলাদের ক্ষেত্রেও সেই আগের অবস্থা এখনো বিরাজমান। এ ধরনের বিরল ঘটনা অসম রাজ্য ছাড়া স্বাধীন ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে নেই, এমনকী বিশ্বের অন্য কোনো দেশে আছে বলেও আমার জানা নেই। তাই এটা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সবচাইতে লজ্জাজনক ঘটনা। আরো অবাক করার মতো ঘটনা হচ্ছে, কারাগারের নিয়মেই রয়েছে জেল-ম্যানুয়াল মতে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি দেওয়া, আর ঠিক সেই একই ভাবেই ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দিদেরও খাওয়া-দাওয়া দেওয়া হয়।

সকলের জানা, কারাগারে বন্দিদের ১৪ দিন পর পর গাড়ি দিয়ে আদালতে আনা হয়, প্রতি মাসেই স্থানীয় বিচারপতিরা কারাগার পরিদর্শনে যান। কিন্তু ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দিদের কপালে এটুকুও জোটে না। তারা কেমন আছে খবরটুকু নেওয়ার কী বিধান নেই

রাজ্যের ডিটেনশন ক্যাম্পগুলিতে ভয়াবহ পরিবেশে হিন্দুদের দিন কাটাতে হচ্ছে। বাঙালি হিন্দু সমাজকে একক শক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ ও আত্মবলীয়ান হয়ে এর বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টির লড়াইয়ে নামতে হবে। নতুবা অসম রাজ্যের বাঙালি হিন্দুর ভাগ্যলিপির কোনো পরিবর্তন হবে না।

দেশে! তাদের দুর্দশা ও অব্যবস্থার কথাটুকু জানানোর কি কোনো স্থান নেই ভারতের কোথাও? কারাগারের কয়েদিরা যেভাবে দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য জানালায় হাজির হন ঠিক সেই একইভাবে ডিটেনশন ক্যাম্পের বন্দিরা আত্মীয়স্বজনদের নাগাল পান। একদিকে চলছে সেই চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো জঘন্য কাজ। আর অন্যদিকে ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর জারি হওয়া পাসপোর্ট ও বিদেশি আইনের উপর দুটি গ্যাজেট নোটিফিকেশন থাকা সত্ত্বেও সমগ্র অসম রাজ্যে কারাগারের ভিতরে থাকা ৬টি ডিটেনশন ক্যাম্প যথাক্রমে— গোয়ালপাড়া, কোকরাঝাড়, শিলচর, ডিব্রুগড়, জোরহাট এবং তেজপুরে হিন্দু বন্দিদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আমরা যদি শুধুমাত্র শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পের দিকে তাকাই তখন আমাদের সামনে ফুটে উঠবে এক মর্মান্তিক চিত্র। যদি আমরা নিজের মনকে প্রশ্ন করি, ডিটেনশন ক্যাম্পে যারা বন্দি রয়েছেন তারা কতদিন বন্দি থাকবেন? সহজ ভাষায় উত্তর হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার যতদিন না তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে গ্রহণ করবে এবং যতদিন না উভয় দেশের মধ্যে কোনো চুক্তি হচ্ছে। তাই তাদের ভাগ্যলিপি কী তা ভাবলেই গা শিউরে উঠে। আর এই ভাগ্যলিপির মধ্যেই শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পে মোট ২২ জন বন্দি রয়েছেন ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন বা আদেশক্রমে। এছাড়াও রয়েছেন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি বিদেশি রাষ্ট্রের ২৫ জন নাগরিক। ফৌজদারি আদালতের শাস্তির মেয়াদ শেষ করে নিজ দেশ গ্রহণ না করা অবধি অতিরিক্ত ভাবে তারা ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি। শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকা ২২ জন বন্দির মধ্যে হিন্দু বন্দির সংখ্যা ১৪ জন। আর এই ১৪

শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পের বন্দির তালিকা		
বন্দি ব্যক্তির নাম	**বয়স**	**বন্দিত্বের মেয়াদ**
বিক্রম নন্দু কালিন্দী	৮০ বৎসর	১ বছর ১১ দিন
সুন্দর মনি রায়	৭৫ বৎসর	৫ মাস
যুনু দাশ তালুকদার	৬৫ বৎসর	১ বছর ৬ মাস
গীতা নমঃশূদ্র	৬৫ বৎসর	১ বছর ৬ মাস
মুকুল দেব	৬১ বৎসর	২ মাস
নিকুঞ্জ পাল	৬১ বৎসর	৪ মাস
সুনিল রায় ওরফে সুধনা রায়	৫৫ বৎসর	১ বছর
সাধন মালাকার	৫৫ বৎসর	১ বছর
কাঞ্চন দত্ত	৫২ বৎসর	৭ মাস
জ্যোতি রায়	৫০ বৎসর	৫ মাস
অরুণ দাশ	৪৯ বৎসর	১ বছর ৬ মাস
বেনু দাশ	৪৬ বৎসর	১ বছর ১ মাস
সুকদেব রী	৪০ বৎসর	৮ মাস
সাদিক আলি	৫৪ বৎসর	২ মাস
সুনাম উদ্দিন	৪৫ বৎসর	২ মাস
মঞ্জুর আহমেদ	৪০ বৎসর	৩ মাস
আব্দুল কাদির	৫৩ বৎসর	১ বছর
আব্দুল গনি	৪৫ বৎসর	১ বছর
ইসমাইল আলি তালুকদার	৬৮ বৎসর	৫ মাস
সামাদ উদ্দিন ওরফে আব্দুল সামাদ	৩২ বৎসর	৬ মাস
কমরুল ইসলাম লস্কর	২৮ বৎসর	৯ মাস
গোপাল দাশ	৭৫ বৎসর	৬ দিন

জন বন্দির উপর সরকার নামে যে প্রশাসন যন্ত্র রয়েছে রাজ্যে এবং দেশে সেই যন্ত্র ইচ্ছে করলে ওদের উপর বহুচর্চিত নোটিফিকেশন দু'টি কার্যকরী করে ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারে। কিন্তু ঘটনাচক্রে উল্টোটাই ঘটছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি হাইলাকান্দি জেলার ৭৫ বছর বয়সের গোপাল দাশ নামের এক ব্যক্তিকে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি করা হয়। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের বিচারপ্রক্রিয়াধীন থাকা একমাত্র মহিলা বন্দি হচ্ছেন হিন্দু। করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি এলাকার ৬৫ বছরের গীতা নমঃশূদ্র। বিগত ২০১৫ সালের ২ আগস্ট থেকে আজ অবধি শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পে তিনি বন্দি। ২০১৫ সালের ১৪ আগস্ট আরো দুজন হিন্দুকে বন্দি করে রাখা হয়। এই তিনজনকে শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি করে রাখা হয় ২০১৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পাসপোর্ট ও বিদেশি আইনের উপর দুটি গ্যাজেট নোটিফিকেশনের জারি হওয়ার পূর্বে। আর নোটিফিকেশন জারি হওয়ার পর মোট ১১ জন হিন্দু বন্দি বর্তমানে শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পে রয়েছেন।

এছাড়াও যদি আমরা প্রতিটি বন্দির বয়স দেখি তখন দেখব সবচাইতে বেশি বয়স্ক যে তিনজন রয়েছেন ডিটেনশন ক্যাম্পে তাঁরা হিন্দু— (১) বিক্রম নন্দু কালিন্দী, বয়স ৮০ বছর, (২) সুন্দর মণি রায়, বয়স ৭৫ বছর, (৩) গোপাল দাশ, বয়স ৭৫ বছর। এখন মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এই দু'টি নোটিফিকেশন জারি করা হলো? ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের পর অসম রাজ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় হিন্দুদের কাছে কেন্দ্রের মোদী সরকারের জারি করা দুটি গেজেট নোটিফিকেশন নিয়ে। কিন্তু আজ সেই আলোচনা ধীরে ধীরে সমালোচনার পাহাড়ে স্তিমিত হয়ে সামনে চলে এসেছে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রসঙ্গ, অসমের নাগরিক পঞ্জি এবং ওআই এবং এনওআই সমস্যা ইত্যাদি। যদিও নাগরিকত্ব বিলের ভবিষ্যৎ এখন বিশবাঁও জলে। বিলটি রয়েছে বর্তমানে সিলেক্ট কমিটির কাছে। বিলটির মধ্যে রয়েছে অনেক খামতি বা ফাঁক। মনে ধোঁয়াশা রয়েছে যে সিলেক্ট কমিটি আদৌ তাদের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চলতি বাজেট অধিবেশনে দাখিল করেছে কিনা। এসবের পরেও কংগ্রেসকেই দোষারোপ করতে হয়। কেননা ডি-ভোটার তকমা লাগানো হয় কংগ্রেস শাসনকালে, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন প্রথম সংশোধন করে ৬ (ক) ধারা সন্নিবেষ্টিত করা হয় কংগ্রেস শাসনকালে, ডিটেনশন ক্যাম্প কারাগারে তৈরি করা হয় কংগ্রেস জমানায়। কিন্তু এখন সমালোচনার বা দোষারোপ করার সময় নয়। এখনই উপযুক্ত সময় বহুচর্চিত কেন্দ্রের দেওয়া দু'টি গ্যাজেট নোটিফিকেশন রাজ্যে কার্যকরী করে তোলা। নোটিফিকেশন বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের জানা। আর কেন্দ্র সরকার কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলায় হলফনামা দাখিল করে জানিয়েছে নোটিফিকেশনের শর্ত হচ্ছে— (১) বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ অর্থাৎ হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বুদ্ধ, পার্শি, এবং শিখ ধর্মালম্বী হতে হবে। (২) ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আসতে হবে। (৩) ভারতে প্রবেশের সময় হতে হবে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে। রাজ্য সরকারের এক্ষুনি উচিত কেন্দ্রের দুটি নির্দেশ (গ্যাজেট নোটিফিকেশন) মেনে পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনকে এই ব্যাপারে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা। গ্যাজেট নোটিফিকেশনে ক্যাম্পের ভয়াবহ পরিবেশে হিন্দুদের দিন কাটাতে হবে না বা পুশব্যাক আটকানো যাবে। ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকা হিন্দুরা ছাড় পাবেন। আর সেজন্য চাই রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। আর এই লড়াইয়ে অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে এবং অন্য কারো সাহায্য বা সমর্থন প্রত্যাশী না হয়ে বাঙালি হিন্দু সমাজকে একক শক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ ও আত্মবলীয়ান হয়ে চাপ সৃষ্টির লড়াইয়ে নামতে হবে। এখনই উপযুক্ত সময়। নতুবা এক্ষেত্রে অসম রাজ্যের বাঙালি হিন্দুর ভাগ্যলিপির কোনো পরিবর্তন হবে না।

ইসলামি মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারেক ফতেহ্‌র লড়াই

সন্দীপ চক্রবর্তী

জি নিউজের সাম্প্রতিক অনুষ্ঠান 'ফতেহ্ কা ফতোয়া' ইসলামি মোল্লাতন্ত্রকে রীতিমতো ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। যেসব চোখা প্রশ্নবাণ মোল্লাদের দিকে ধেয়ে আসছে তার মোকাবিলা করতে গিয়ে ইসলামের অজস্র ফাঁকফোকর যেমন বেরিয়ে পড়ছে ঠিক তেমনি করে মজহব বা রিলিজিয়নের সঙ্গে ধর্মের মেরুকরণটিও ঘটছে সাবলীলভাবে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক লেখক চিন্তাবিদ এবং সাংবাদিক তারেক ফতেহ্। তাঁর বাবা-মা এক সময় রাজস্থানে থাকতেন। পরে লাহোরে চলে যান। তারেক ফতেহ্-র জন্ম করাচিতে। মাত্র বারো বছর বয়েসে তিনি বালুচদের প্রতি পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জেলে গিয়েছিলেন। ইসলামি দুনিয়ার অজস্র নৃশংস ঘটনাবলীর তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সৌদি আরবে শাসকবর্গের প্ররোচনায় চার শতাধিক শিয়াপন্থী মুসলমানের হত্যা। এখন তারেক কানাডায় থাকেন। কিন্তু নিজেকে হিন্দুস্থানী ভাবতে ভালোবাসেন। গর্বভরে নিজের হিন্দু পূর্বপুরুষদের কথা বলেন। সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের যত সামাজিক সমস্যা রয়েছে তারেক বরাবর তাই নিয়ে সরব হয়েছেন। ভারতে ক্রমবর্ধমান মোল্লাতন্ত্রের তিনি কট্টর সমালোচক। প্রায়শই তিনি আল্লাহ্‌র ইসলাম আর মোল্লার ইসলামের পার্থক্য জলের মতো সরল করে বুঝিয়ে দেন। এরকম একজন মানুষ যে মোল্লাদের চক্ষুশূল হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

মানতেই হবে, তারেক ফতেহ্‌কে শনি ও রবিবার রাত আটটার প্রাইম টাইমে শো করতে দিয়ে জি নিউজ যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। অনুষ্ঠানে যারা অংশ নিচ্ছেন তাদের মধ্যে মোল্লা ও মুফতিরা যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন অন্যান্য ইসলামি পণ্ডিত এবং জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে আসা সাধারণ মুসলমান জনতা। মুসলমান সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারেক আলোচনার জন্য বেছে নেন। তার মধ্যে রয়েছে তিন তালাক, কাফেরের সংজ্ঞা নিরূপণ এবং ভারতের মুসলমান সমাজে গজওয়া-ই-হিন্দকে জনপ্রিয় করে তোলার মতো বিষয়। এইসব বিষয়ে কথা বলার সময় অধিকাংশ বক্তা মেজাজ হারিয়ে ফেলেন এবং কী বলছেন, কেন বলছেন— তার ওপরেও তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তারেক ফতেহ্-র কথাবার্তা শুনে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তিনি বোধহয় ইসলাম বিরোধী। অনুষ্ঠান চলাকালীন একবার এক মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন, ইসলামের এমন কোনো বিষয় কি আছে যা তারেকের ভালো লাগে? তারেক উত্তর দিয়েছিলেন, কোরান বলে, সর্বস্ব হারিয়ে ফেলার পরেও একজন মানুষের সত্যি কথা বলার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এটা তার ভালো লাগে। ভালো লাগে বলেই তিনি সত্যি কথা বলেন।

শো তৃতীয় সপ্তাহ পেরিয়ে যাবার পরেই

মোটামুটি আন্দাজ করা গিয়েছিল, এবার মুফতিরা ফতোয়া জারি করবে। নয়তো শো বন্ধ করার আবেদন নিয়ে আদালতে যাবে। এবং তাই ঘটল। ক্ষুব্ধ এবং ভীত মুফতি ও উলামারা শো নিষিদ্ধ করার আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গেল।

তারেকের ক্ষুরধার যুক্তি এবং সরস টিপ্পনিগুলো মোটেই স্বাদু নয়। বিশেষ করে মোল্লাতন্ত্রের ধ্বজাধারী বীরপুঙ্গবদের কাছে। একজন মুফতি জানালেন, শো শুরু হবার পর থেকেই তার কাছে নাকি বন্যার মতো টেলিফোন আসছে। সকলের দাবি, অবিলম্বে শো বন্ধ করো। বস্তুত অনুষ্ঠানে যেসব মুফতি-উলামা অংশগ্রহণ করে তারা প্রায়ই ধর্মত্যাগী ব্যক্তির মতো আচরণ করার জন্য তারেক ফতেহ্‌কে কথার মারপ্যাঁচে উত্তম-মধ্যম দেন। এমনকী, যেসব মহিলা বিতর্কে যোগদান করেন তাদেরও পোশাক নিয়ে কটুকাটব্য করেন। মোল্লাদের বক্তব্য, আব্রু রক্ষার্থে মেয়েদের সবসময় বোরখার আড়ালে থাকা উচিত। মেয়েরাও অবশ্য কম যান না। যুক্তির তীক্ষ্ণতায় ধুন্ধুমার বাধিয়ে ছাড়েন। অন্যদিকে তারেক শান্ত-সুস্থির ভঙ্গিতে উন্মোচন করতে থাকেন ইসলামের অন্দরমহল। দেখিয়ে দেন কোথায়-কোথায় ইসলাম অমানবিক, এমনকী মানবতা-বিরোধীও। এবং লিঙ্গবৈষম্যের সমর্থক। খ্যাত-অখ্যাত নানা প্রতিষ্ঠানের ধর্মগুরু এইসব মোল্লাদের নারীবিদ্বেষের জন্য তারেক তীব্র ভাষায় তাদের তিরস্কার করেন। যেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত কয়েকজন মুফতি এককথায় তিনতালাক প্রথার অনিবার্যতা মেনে নিল সেদিন তারেক তাদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। আমরা যারা সাধারণ দর্শক, জানতে পেরেছিলাম, তালাকের ভয়ে মুসলমান মেয়েরা কতটা চাপের মধ্যে থাকেন এবং হিংস্র ও উন্মাদ পুরুষতন্ত্রের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু সবই ভস্মে ঘি ঢালা! মুফতিরা কেউ তার কথা মানেনি। এমনকী তারা এটাও মানেনি যে মহম্মদ বিন কাশিম বা মহম্মদ গজনি এদেশে বহিরাগত। দখলদার। তারা এসেছিল শুধু অত্যাচার আর লুঠপাট করতে। মুফতিদের এই মানসিকতাই প্রমাণ করে তারা এদেশে বাস করলেও এদেশের কেউ নয়। তাদের আরবিকরণ সম্পূর্ণ। একজন মুফতি তো অনুষ্ঠানের নামের বৈধতার প্রশ্ন তুলে তারেককে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। তার জিজ্ঞাসা : কোন অধিকারে তারেক ফতোয়া জারি করছেন? তারেক সবিনয়ে জানালেন অনুষ্ঠানের নামে ব্যবহৃত 'ফতোয়া' শব্দটির সঙ্গে ধর্মীয় ফতোয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একটা প্রতীকী ব্যাপার। কিন্তু নিরেট মাথায় অত কি ঢোকে! আর একজন বললেন, তারেকের ভারতে ঢোকা এখনই 'ব্যান' করে দেওয়া উচিত। এ কথার উত্তরে তারেক পূর্ববৎ বিনয়ের সঙ্গে জানান, আরব বা মোঙ্গলদের জন্য না হলেও, একজন হিন্দুস্থানী হিসেবে এদেশ তার মাতৃভূমি। গত ৫০০০ বছর ধরে হিন্দুস্থানীরা এদেশের ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িত। সারা দুনিয়ায় এখনও এমন কারও জন্ম হয়নি, যে একজন হিন্দুস্থানীকে ভারতে ঢুকতে বাধা দিতে পারে।

এখানে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নিজেকে হিন্দুস্থানী বলে তারেক ভারতের মোল্লা-মুফতি-মৌলবিদের বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করে দিলেন। সেই সঙ্গে দেখিয়ে দিলেন ভারতে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা আরবিকরণের পশ্চাৎপটটি। যাই হোক, একদিন মোল্লাতন্ত্রের ক্রীড়নকেরা বড়োসড়ো প্রত্যাঘাত করল। এক মুফতি এযাবৎ তারেকের সমস্ত অপরাধের বর্ণনা দিয়ে তাকে কাফের বলে ঘোষণা করল। তারেক বললেন, যদি সত্যি কথা বলার জন্য তাকে কাফের হতে হয় তাহলে তিনি তাই। অর্থাৎ কাফের।

তবে তিনি যাই বলুন, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এই ঘোষণা তারেকের বিপদ বাড়িয়ে দিতে পারে। মৌলবাদের লজেন্স-চোষা যে-কোনো জিহাদি যদি ওই মুফতির ঘোষণাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয় তাহলে তারেক ফতেহ্‌কে প্রকাশ্যে অথবা গুপ্তহত্যা করার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। বিশেষ করে কোরান যেখানে বলছে, 'যদি কেউ ধর্মত্যাগ করে, যেখানেই থাকুক তাকে বন্দি করো। তারপর খুন করো। ধর্মত্যাগীদের বন্ধু ভেবো না, কোনো সাহায্যও নিয়ো না তাদের কাছ থেকে', (কোরান : ৪.৮৯ অনুবাদ এ. ইউসুফ আলি)--- সেখানে জন্নতের আশায় যে-কোনো জিহাদির পক্ষে তারেককে হত্যা করা অসম্ভব কিছু নয়। কোরান অনুযায়ী কে জন্নতে (স্বর্গে) যাবে আর কেই বা জাহান্নামে (নরক) যাবে তা ঠিক হয় কয়ামতের দিন। তার অবশ্য এখনও দেরি আছে।

কিন্তু কয়ামতের দিন আসতে যত দেরিই হোক, তারেক ফতেহ্‌-র বিপদ তাতে কাটছে না। যদিও তারেক কিছুদিন আগেই বলেছেন, ৬৭ বছর বয়েসে পৌঁছে তিনি কোনো কিছুতেই আর ভয় পান না। তার ওপর হামলা হলে, হবে। কেউ তাকে মারতে চাইলে, মারবে। তবুও তিনি তার কথা বলে যাবেন। সব নির্ভেজাল সত্যি কথা।

মোল্লাতন্ত্রের ভয় ওই সত্যি কথাতেই। এতকাল অ-মুসলমানরা তাদের সমালোচনা করেছেন। তারা গুরুত্ব দেননি। উল্টে মোল্লাতন্ত্রের আড়ালে জঙ্গিতন্ত্র কায়েম করে চুপ করিয়ে রাখতে চেয়েছেন আপামর বিশ্ববাসীকে। এই প্রথম একজন পাকিস্তান-জাত মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। হাটে হাঁড়ি ভাঙছেন নির্মমভাবে। ভয় তো হবেই। ভারতের ইতিহাসবিদ, লেখক, সাংবাদিক থেকে রাজনৈতিক দলগুলো কখনও ধর্ম নিরপেক্ষতা কখনও বা সহনশীলতার আড়ালে সুফিবাদের যুক্তি দেখিয়ে ইসলামকে শান্তির অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তারেক ফতেহ্‌-র অর্বাচীনতায় তাদের চেষ্টাও মাঠে মারা যাচ্ছে। সুতরাং শত্রু তাঁর সর্বত্র। কিন্তু যিনি নিজেকে ভারতীয় ভাবেন, এ দেশকে মাতৃভূমি জ্ঞানে সম্মান করেন তাঁকে রক্ষা করা প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য। কারণ মুসলমানদের একচেটিয়া আরবিকরণের পর আবার ভারতীয়করণ করতে হলে তারেক ফতেহ্‌র মতো ব্যক্তিরাই উপযুক্ত। সুতরাং তিনি যাতে তাঁর কাজ ঠিকমতো করতে পারেন সেটা নিশ্চিত করা এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ■

এন আর আই দম্পতির স্বচ্ছ ভারত অভিযান

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নিতান্ত অল্প বয়েসেই আশিস কালাওয়ার নিজের একটি অন্যরকম ভবিষ্যতের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন। তাঁর মুখেই ঘটনাটা শোনা যাক। —'বাড়ি ফিরব বলে আমি ট্রেনের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎই একটা বাচ্চা ছেলে এগিয়ে এসে আমার জুতো পালিশ করতে চাইল। আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললাম, এই বয়েসে কাজ না করে তার স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। ছেলেটা বলল, লেখাপড়া শিখতে যে টাকা লাগবে তা রোজগার করার জন্যেই সে কাজ করছে। ওইটুকু একটা ছেলের নিজের ওপর বিশ্বাস, শক্তি আর সংযম দেখে আমি হতবাক। সেই মুহূর্তে ঠিক করলাম কাজ তো ওকে দেবই, উপরন্তু যে পারিশ্রমিক ও চাইবে তার দ্বিগুণ দেব।'

দত্তক নেওয়া গ্রামের শিশুদের মাঝে ঋতা (বাঁয়ে) ও আশিস।

সেদিনের সেই বাচ্চাটির অনাবিল হাসি আশিসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, দুর্ভাগ্যতাড়িত এরকম শিশু ও কিশোরদের পাশে দাঁড়ানোর মতো আনন্দ জীবনের অন্য কিছুতেই নেই।

এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পর আশিসের বিয়ে হলো। নববিবাহিতা স্ত্রী ঋতা স্বামীর মনের কথা জানতে পেরে সানন্দে সম্মতি দিলেন। কিন্তু সেবার ভাবনা আর সেই ভাবনার রূপদান এক নয়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পেশায় ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার। ২০০৯ সালে ইংলন্ডে স্থিতু হবার আগে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। ইংলন্ডে থাকার সময়েই আশিস আর ঋতা স্থানীয় একটি মন্দিরের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নানা ধরনের সেবাকাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের প্রধান দায়িত্ব ছিল অর্থসংগ্রহের।

সেই সময় আশিসের মনে হোত, তাঁরা যদি বিদেশে সেবাকাজ করতে পারেন নিজের দেশের জন্য কেন পারবেন না। এই ভাবনাই তাদের পথ বদলে দিল। সেটা ২০১২ সাল। আশিস আর ঋতা মহারাষ্ট্রের লোনওয়াড়ি নামের একটি গ্রাম দত্তক নিলেন। গ্রামটি পিছিয়ে পড়া। গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের মান ভয়াবহ। ঋতা বলেন, 'বাড়িতে টয়লেটের কথা ভুলে যান, গ্রামের মানুষের জীবনসংগ্রাম এতটাই কঠিন ছিল যে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বেঁচে থাকা কাকে বলে ওরা তাই জানত না।'

কথাটা মিথ্যে নয়। মহারাষ্ট্রের ইয়াভাতসল জেলার লোনওয়াড়ি গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না, পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না, রাস্তাঘাট ছিল না এবং গ্রামে কোনো শৌচালয়ও ছিল না।

একটি এনজিও-র সহায়তায় আশিস আর ঋতা লোনওয়াড়িকে আদর্শ গ্রাম বানানোর সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। প্রথম দিকে বছরে একবার কী দু'বার আসতেন। ২০১৪ সালে এই দম্পতি ইংলন্ডের লোভনীয় চাকরি এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পিছুটান ত্যাগ করে পাকাপাকি ভাবে ভারতে চলে আসেন। তারপর ক্রমশ হয়ে ওঠেন লোনওয়াড়িরই একজন। গ্রামটিও বদলে যেতে থাকে।

পানীয় জলের সমস্যা দূর করাই ছিল প্রথম কাজ। আগে গ্রামের লোকেরা পাহাড় থেকে নীচে নেমে জল আনতে যেত। সৌরশক্তি চালিত ট্যাঙ্ক বসানোর পর আর নীচে নামতে হয় না। পাতালের জল পাহাড়ের চূড়োয় উঠে যায়।

আরও একটা বিষয় আশিস আর ঋতা লক্ষ্য করেছিলেন। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য লোনওয়াড়ির মেয়েদের বাইরে যেতে হয়। কোনো বাড়িতে শৌচালয় নেই। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ডাক দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে এই দম্পতি কাজে নামলেন। কিন্তু শুধু শৌচালয় তৈরি করে দিলেই তো আর হয় না। গরিবগুর্বো মানুষগুলোকে শৌচালয় সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলা দরকার। তবেই তাঁরা দীর্ঘদিনের অভ্যেস বদলাতে পারবেন। কিন্তু কীভাবে? অভিনব পন্থা বের করলেন আশিস। জঙ্গলের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ঘাসপাতা ফুল কেটে এনে শৌচালয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। চার দেওয়ালের মধ্যে জঙ্গলের পরিবেশ পেয়ে লোনওয়াড়ি শৌচালয় ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। এখন সেখানে দুটো বায়ো-টয়লেট, দুর্দান্ত রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা— এমনকী একটা ডিজিটাল স্কুলও রয়েছে।

আশিস আর ঋতার প্রেরণায় লোনওয়াড়ি ধীরে ধীরে আদর্শ গ্রাম হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

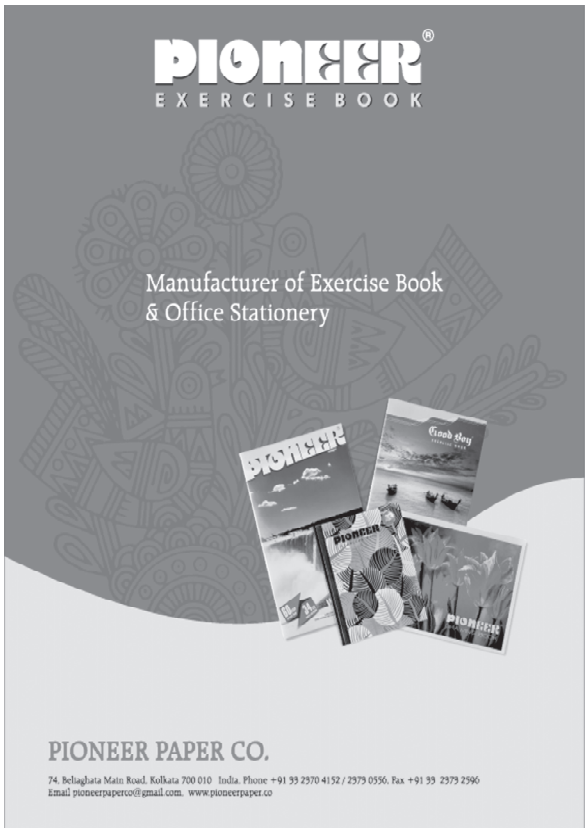

"ভারতের প্রতিটি ভয়ার্ত ক্রন্দন, দুর্বলতাপ্রসূত উত্তেজনা, অপমানজাত সঙ্কোচবোধ তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) অনুভব করতেন। ভারতের অন্যায় আচরণের তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক, তার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার উপর খড়্গহস্ত, কিন্তু সে কেবল ঐ দোষগুলিকে তিনি নিজেরই মনে করতেন বলে। পক্ষান্তরে তাঁর মতো আর কেউ ভারতের ভাবী মহিমার কল্পনায় এত অভিভূত হতেন না।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

শিশুর বিছানায় প্রস্রাব ও হোমিওপ্যাথি

ডাঃ রিংকী ব্যানার্জী

শিশুরা বিছানাতে প্রস্রাব করবে এটা সাধারণ ব্যাপার। তবে মোটামুটিভাবে দুই-তিন বছর বয়স থেকে এদের বাথরুমে যাওয়ার অভ্যেস হয়ে যায় বলে বিছানা ভেজানোর সমস্যাটা কমে আসে। মাঝে মধ্যে দু-একদিন করলে ওটাকে কেউ সমস্যার মধ্যে ধরে না। অনেকের আবার পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত বিছানা ভেজায়। দিনের বেলায় বিছানা না ভেজালেও অনেকে রাত্রে নিয়মিতভাবেই বিছানা ভেজায়। শিশুর বয়স ছয় বছর পর্যন্ত এই বিছানা ভেজানোকে চিকিৎসকরা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেন, কিন্তু তার পর বিষয়টাকে আর স্বাভাবিক বলা যায় না। তখন বুঝতে হবে হয়তো শিশুর অন্যকোনো সমস্যা

রয়েছে। যে যে কারণে শিশুরা বিছানা ভেজায় তা হলো— (১) কোনো মানসিক সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে বাচ্চার ভেতরে রয়েছে, অথচ বলতে পারছে না। (২) নতুন কোনো স্কুলে যাওয়ার পর সহপাঠী বা শিক্ষকদেরও কোনো আচরণে শিশু ভয় পেলে বেড ওয়েটিংয়ের সমস্যা হয়। (৩) বন্ধুদের সঙ্গে যদি হাসি, উপহাস বেশি হতে থাকে ও শিশু তার সঙ্গে না মানাতে পারে, তাহলে এই সমস্যাও হতে পারে। (৪) কিডনির সমস্যা বা ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে কিনা তা একবার পরীক্ষা করানো অত্যাবশ্যক। (৫) ইউরিনে সংক্রমণ রয়েছে কিনা তা একই সঙ্গে পরীক্ষা করে নেবেন। (৬) পরিবারে ডায়াবেটিসের ইতিহাস থাকলে খাবার ব্যাপারে সতর্ক হোন।

সতর্কতা

(১) শিশু যদি একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরও বেড ওয়েটিং করে, শিশু বিশেষজ্ঞকে দেখান শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। (২) শিশুকে দিনের বেলায় পর্যাপ্ত জল খাওয়ান, বিকেলের পর জলের পরিমাণটা কমিয়ে দিন। (৩) রাত্রে ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে শিশুকে তুলে বাথরুমে নিয়ে যান। এজন্য ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখুন। (৪) শিশুকে একান্তে না বকে স্নেহশীলভাবে জিজ্ঞেস করুন? কোনো কিছুতে ভয় পেয়েছে কিনা অথবা ওর স্কুলে কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা। থাকলে সেটা জেনে ওর টিচারের সঙ্গে কথা বলুন। পরিবেশ বদলালে ওর ভয়টা কেটে যাবে। প্রয়োজনে কাউন্সেলিং করান।

কারণ এবং লক্ষণ মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে। লক্ষণ অনুযায়ী কস্টিকাম, রাস এ্যারোমেটিকাস, সিনা, টিউক্রিয়াম প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ফোন : ৯৮৩০৫০২৫৪৩

নখের অসুখে হোমিওপ্যাথি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

অনেকে উপহাস করে বলবেন নখের সমস্যাটা কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু সমস্যা সমস্যাই। রোগকে ছোট ভাবতে নেই।

এবড়ো-খেবড়ো নখ : এবড়ো-খেবড়ো নখ আমি অ্যান্টিমক্রড় ব্যবহার করে ফল পেয়েছি।

গর্ত গর্ত নখ : সোরিয়াসিসের সমস্যায় নখ গর্ত গর্ত হয়ে যায়। সোরিয়াসিস একটি জটিল রোগ। আমার বাবা ডাঃ প্রকাশ মল্লিকের কাছে সোরিয়াসিসের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করতে দেখেছি। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি ধাতুগত চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রসূ।

চামচের মতো নখ : এ রোগে নখের মাঝখানটা নিচু আর চারপাশ উঁচু হয়ে যায়। তার ফলে নখের আকৃতি এমন হয়ে যায় যে, এ সমস্যা জন্মগত কারণ ছাড়াও রক্তাল্পতার কারণেও হতে পারে। এক্ষেত্রে রক্তাল্পতার চিকিৎসা করতে হবে।

রং পালটে যাওয়া নখ : যাঁরা রং-য়ের দোকানে কাজ করেন তাঁদের নখ হলদেটে হয়ে যায়। নিয়মিত নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করার জন্য, এক্ষেত্রে আমি প্লানটাগো θ মাদার এবং অ্যাসিড নাইট্রিক ২০০ শক্তিতে ওষুধ দিয়ে ফল পেয়েছি। জন্ডিস হলেও নখ হলুদ হয়ে যায়, এক্ষেত্রে জন্ডিসের হোমিওপ্যাথিক ধাতুগত চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়।

আকার ও আকৃতির পরিবর্তন : লাইকেন গ্ল্যানাস এক ধরনের রোগ, যার কারণে নখের আকার ও আকৃতির পরিবর্তন পরিবর্তন হতে পারে। নখ গোড়া থেকে উঠে আসে। নখের সামনে থেকে লম্বালম্বি ভাবে মোটা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমি স্টাফাইলোক্কসিন- ২০০ ব্যবহার করে ফল পাই।

নখ নরম হওয়া : মূলত বংশগত কারণে কারও কারও হাত ও পায়ের নখ নরম হয়ে যায়। শরীরে প্রোটিনের অভাব ঘটলেও নখ নরম হতে পারে। তবে নানা রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এসে নখ নরম হলে এমন ঘটনা বিরল নয়। নখ নরমের লক্ষণে আমি ক্যালিফস দিয়ে ভাল কাজ পেয়েছি। প্রোটিনের অভাব হলে চায়না মাদার দিয়ে কাজ পেয়েছি।

নখকুনি : ক্যনডিড অ্যালবিক্যানস নামে এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগটি হয়। যারা অনেকটা সময় ধরে জলের কাজ করেন তাঁদের ক্যানডিড এল্বাম-২০০ ব্যবহার করে সুফল পেয়ে থাকি।

নখের দাদ : দাদ শুধুমাত্র শরীরের উপরের দিকের ত্বকের বিভিন্ন জায়গায় হয় এমন নয়। নখেও এটা হতে পারে। এক্ষেত্রে গ্র্যাফাইটিস ১ এম দিয়ে সুফল পেয়ে থাকি।

ফোন : ৯৮৩০৫০২৫৪৩

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দুধর্ম-শিক্ষা- সংস্কৃতি সম্মেলন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ ও শিবরাত্রি উপলক্ষে গত ২০ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পাঁচদিন ব্যাপী কলকাতায় বালিগঞ্জে সঙ্ঘেরই শ্রীনাথ সভাগৃহের সম্মুখে বৈদিক শান্তিযজ্ঞ, শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ জয়ন্তী সম্মেলন, শ্রীশ্রী শিবরাত্রি মহোৎসব, রক্ষিদলের ক্রীড়া প্রদর্শন, গীতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বামী শাশ্বতানন্দজী, স্বামী ভাস্করানন্দজী, স্বামী বিশ্বপ্রেমানন্দজী, স্বামী পরমেশানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী বরুণানন্দজী, স্বামী গুরুপদানন্দজী, স্বামী দিব্যানন্দজী, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী প্রমুখ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীল রাধা বিনোদঠাকুর গোস্বামী, শ্রী অরূপ প্রধান (শ্রীশ্রী অনুকুল ঠাকুর আশ্রমের অধ্যক্ষ), অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাজ্য সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, নৈতিক চরিত্রগঠনে স্বামী প্রণবানন্দ, অনুন্নতোন্নয়নে সঙ্ঘ, বিশ্বকল্যাণে দেবাদিদেব মহাদেব ছিল বক্তব্যের বিষয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পৌঁছায় এবং সেখানে শতবর্ষ অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে ভারতনাট্যম্, নৃত্যনাট্য, যাত্রাভিনয়, বাউল সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

মাথাভাঙ্গায় পারিবারিক বনভোজন

পশ্চিম কোচবিহার জেলার সঙ্ঘের পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে গত ৫ ফেব্রুয়ারি মাথাভাঙ্গায় একটি পারিবারিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৭ জন এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। বনভোজনে হিন্দু পরিবারের ঐতিহ্য ও বর্তমান অবস্থার বিষয় তুলে ধরেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পরিবার প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সঙ্ঘচালক প্রবীর কুমার রায়, জেলা কার্যবাহ চন্দন কুণ্ডু, জেলা পরিবার প্রবোধন প্রমুখ অভিজিৎ রায়।

শিবপুরে অঙ্গদান বিষয়ে আলোচনা সভা

গত ১২ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরির বিবেকানন্দ সেমিনার হলে শরৎ সরকার ট্রাস্ট অঙ্গদান বিষয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ট্রাস্টি কল্যাণী সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী চক্রবর্তী। কালী প্রসাদ ভট্টাচার্যের সুন্দর পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শ্রী ভট্টাচার্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের নানা তথ্য দিয়ে সকলকে সুন্দরভাবে আলোকিত করেন।

ট্রাস্টের সদস্য সুদীপ্ত সরকার অঙ্গদান সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। গত ১৫ জানুয়ারি আয়োজিত অঙ্গদান বিষয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের অভিনন্দন জানান। ইচ্ছুক অঙ্গদাতাদের আন্তরিক সুভেচ্ছা জানান। ট্রাস্টের আর এক সদস্য শ্যামল ভৌমিক ট্রাস্টের অন্যান্য নানাবিধ কাজ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। শিবপুরের বিশিষ্ট অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জেন ডাঃ দেবব্রত মুখার্জী অঙ্গদান বিষয়ে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। ডাঃ মুখার্জী কোমা ও ব্রেন ডেথের পার্থক্য বিশদে ব্যাখ্যা করে সমস্ত শ্রোতার মনে একটা ধারণার সঞ্চার করেন। সভাপতি অম্বর মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সুব্রত ব্যানার্জী প্রমুখ বক্তা অনুষ্ঠানে বিভিন্নভাবে অঙ্গদান আন্দোলনকে সমর্থন জানান।

সমাবেশ সমাচার

অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক অঙ্গদাতাদের সাম্মানিক স্মৃতিপদক দেওয়া হয় ও তাঁদের অনুভূতি বলতে অনুরোধ করা হয়। বিশিষ্ট শিক্ষক স্বপন দাসগুপ্ত তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেন যা উপস্থিত শ্রোতাদের উৎসাহিত করে। মোট ১৩ জন অঙ্গদাতা ছিলেন। এরপর বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

কলকাতায় শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা

গত ১২ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৩১তম জন্মোৎসব উপলক্ষে কলকাতায় বাগবাজারে শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা হয়ে গেল। উদ্যোক্তা গৌড়ীয় মিশন এবং মহানাম সেবক সঙ্ঘ। ১২ ফেব্রুয়ারি সকালে কলকাতায় নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বৈষ্ণবধর্ম সম্মেলন, আধুনিক সমাজ ও শিক্ষার পরিশুদ্ধির সম্ভাবনা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবনা ছিল আলোচনার বিষয়। সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এইসব বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিদিনই ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির মঞ্চ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী।

চিকিৎসা শিবির

গত ৫ মার্চ ২০১৭ সেবাভারতী উত্তর মালদহ ট্রাস্ট চাঁচলের পরিচালনায় অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। চিকিৎসা করেন ডাঃ ভূদেব সাহা। ৭০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন

আসানসোলে স্বদেশ বিকাশ কেন্দ্রের বার্ষিক সম্মেলন

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সমাজ সেবা ভারতী (প.ব.)-র অনুমোদিত আসানসোলের স্বদেশ বিকাশ কেন্দ্রের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আসানসোলের গুজরাটি ভবনে। স্বদেশ বিকাশ কেন্দ্রের বাইশটি সেবাকেন্দ্রের কার্যকর্তা, আচার্য-আচার্যা, ছাত্রছাত্রী, শুভানুধ্যায়ী-সহ ২৫০ জন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সমাজের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট অধ্যাপক দিবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশেষ অতিথিরূপে ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুতপা বসু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মনোজ চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন মাকুর, লক্ষণলাল গুপ্তা, রবিশঙ্কর সিং, নরেশ মণ্ডল, বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। ভগিনী নিবেদিতার উপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা সুতপা বসু, সেবা ও যুবসমাজ বিষয়ে মনোজ চট্টোপাধ্যায় এবং সমাজ সেবা ভারতী ও স্বদেশ বিকাশ কেন্দ্রের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করেন প্রদ্যুৎমল বসু। অনুষ্ঠানে

নীরব সেবাকর্মী দুর্গাপুরের রাজীব ঘাটিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনি গত ছাব্বিশ বছর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে একটি দরিদ্র গ্রামে প্রতি সপ্তাহে নিঃশুল্ক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে চলেছেন। বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রের জন্য মা সরস্বতীর ফটো, গত বছর উত্তীর্ণ হওয়া সেলাই কেন্দ্রের বোনেদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আয়োজিত বসে আঁকো, শ্লোকপাঠ, সরস্বতী বন্দনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সেলাই কেন্দ্রের বোনেদের তৈরি বিভিন্ন পোশাকের প্রদর্শনীও করা হয়। কয়েকটি বনবাসী অঞ্চলের সেবাকেন্দ্রের ভাইবোনেরা ধামসা, মাদল সহযোগে নৃত্যগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদক কার্তিক দাশগুপ্ত।

মালদা ও দিনাজপুরের বিভাগ সেবাপ্রমুখ রামপ্রসাদ নন্দী, ট্রাস্ট্রের সভাপতি সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী, সম্পাদক ষষ্ঠী শর্মা এবং হীরেন পোদ্দার ও দীপক চট্টোপাধ্যায়।

রক্তদান শিবির

গত ৫ মার্চ বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহযোগিতায় এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, নদীয়া জেলার ব্যবস্থাপনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে সঙ্ঘের জেলা কার্যালয় কৃষ্ণনগরের অরবিন্দ রোডে অবস্থিত বিবেকানন্দ ভবনে। সমাজের সকল স্তরের এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সাফল্য লাভ করে। সর্বমোট ৪৭ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন, যাঁদের মধ্যে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি যেমন ছিলেন তেমনি তিনজন মহিলাও ছিলেন। নদীয়া জেলা হাসপাতালের ব্লাডব্যাঙ্কের ডাক্তার ও কর্মীরা রক্ত সংগ্রহ করেন। উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতায় মেডিক্যাল অফিসার এবং অন্যান্য কর্মীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

মালদা জেলার গাজোলে কদুবাড়ি গ্রামে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ রবিবার উদযাপিত হলো মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকী উৎসব। তারই সঙ্গে হয়ে গেল ঠাকুর পঞ্চানন স্মারক সমিতির গাজোলের কার্যালয়ের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন গাজোল পঞ্চানন স্মারক সমিতির সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ সরকার। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজবংশী উন্নয়ন মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জীতেন্দ্রনাথ সরকার।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ননীগোপাল রায় ও শ্যামাপদ রায়। এঁরা রায়গঞ্জ পঞ্চানন সেবা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক। উপস্থিত ছিলেন গাজোলের বিধায়ক সুনীল চন্দ্র রায়। মালদা মহাবিদ্যালয়ের সহ অধ্যাপকগণ— ড. নির্মলেন্দু মণ্ডল, টগর বালি, শ্রীকঙ্কন সরকার, ড. উৎপল রায় এবং অমূল্য সরকারও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রথমেই সভাপতি ও অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর প্রধান অতিথি ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতির পাদমূলে দীপ প্রজ্বলন করেন এবং পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। তারই সঙ্গে পঞ্চানন স্মারক সমিতির নব কার্যালয়ের

দ্বারোদ্ঘাটন হয়ে যায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের দ্বারা। তারপর এই নতুন কার্যালয়ের দাতা তাপস সরকারকেও বরণ করে নেন সমিতির সম্পাদক বনমালী বর্মন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে পারমিতা সরকার। মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনী ও তাঁর সমাজ সংস্কারের নানান দিক তুলে ধরেন বক্তারা।

বক্তব্য শেষ হওয়ার পর শুরু হয় ভাওয়াইয়া গান। ভাওয়াইয়া গান পরিবেশন করেন নিমাই চক্রবর্তী ও শ্রীমতী অনিমা বর্মন ও তাদের সহযোগীরা। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পরেশ চন্দ্র সরকার।

প্রতিবাদ মিছিল

গত ৬ মার্চ কৃষ্ণনগরে মানবাধিকার রক্ষা মঞ্চ, নদীয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে নদীয়া জেলাশাসকের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কয়েক হাজার গণতন্ত্রপ্রেমী নাগরিকের উপস্থিতিতে কেরলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ মদতে চলা সন্ত্রাসের ফলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী সংগঠনের কর্মী, সমর্থক ও কার্যকর্তাদের নির্বিচার আক্রমণ ও প্রাণঘাতী হামলায় বিগত কয়েক দশক জুড়ে নিহত ২৫০ জনের বেশি মানুষের নির্মম হত্যার প্রতিবাদে মৌন মিছিল সহযোগে প্রতিবাদী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত পদযাত্রা জেলাশাসকের কার্যালয় মোড়ে উপস্থিতি হয়।

কার্যকর্তাবৃন্দ জমায়েতের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। মানবাধিকার রক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে ৫ জনের প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের নিকট স্মারকলিপি জমা দেন।

মঙ্গলনিধি

গত ১৯ জানুয়ারি পূর্বমেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার আনারনগর শাখার স্বয়ংসেবক সনাতন দুয়া'র শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁর বাবা বিশ্বনাথ দুয়া ও মা ঝরনা দুয়া। সেবাভারতীর পক্ষে মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন অসিত চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গানগরের স্বয়ংসেবক তথা নগর প্রচার প্রমুখ সঞ্জয় শর্মার ভাইয়ের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তার বাবা সন্তোষ শর্মা মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা কার্যবাহ চন্দন কুণ্ডুর হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ৫ ফেব্রুয়ারি মালদা জেলার কলিগ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক তপন দাসের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁর বাবা গোপালচন্দ্র দাস ও মা পূর্ণিমা দাস উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ-সেবাপ্রমুখ গৌতম মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

উত্তর চব্বিশ পরগনার (ব্যারাকপুর) ইছাপুর সোদলাপাড়া নিবাসী শ্রী স্বপন ভৌমিক ও দিপালী ভৌমিকের একমাত্র কন্যা সুরঞ্জানার শুভ বিবাহ উপলক্ষে গত ২ মার্চ বিবাহ বাসরে সঙ্ঘের কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের উপস্থিতিতে পূর্ণকালীন কার্যকর্তা অসিত চট্টোপাধ্যায়ের হাতে ৫০০১ টাকা মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন।

* * *

সঙ্ঘের কৃষ্ণনগর শাখার স্বয়ংসেবক ভীষ্মদেব বিশ্বাস-এর (বাপ্পা) শুভ বিবাহ উপলক্ষে তার মাতৃদেবী জ্যোৎস্না বিশ্বাস সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রবীণ প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ২০ হাজার টাকা মঙ্গলনিধিস্বরূপ তুলে দেন।

শোকসংবাদ

দক্ষিণ দিনাজপুর আমরাইল শাখার স্বয়ংসেবক কুমুদরঞ্জন মাহাতো গত ২২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। উল্লেখ্য, তিনি সুগারের রোগী ছিলেন। আলিপুর দুয়ার জেলার কুমারগ্রাম হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি মা, স্ত্রী, ১ বোন ও ১ পুত্র রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ অরবিন্দ পার্ক সরস্বতী শিশু মন্দিরে আচার্য তথা নগরের স্বয়ংসেবক শুভঙ্কর বসাকের পিতৃদেব নিতাই বসাক গত ২০ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি আবাল্য স্বয়ংসেবক ছিলেন। তাঁর পুরো পরিবার সঙ্ঘময়।

* * *

বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর খণ্ডের ব্রাহ্মণডিহা শাখার মুখ্য শিক্ষক চিন্ময় লায়েকের মাতৃদেবী গত ২৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কোচবিহার বিভাগের প্রয়াত সঙ্ঘচালক স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র বর্মনের স্ত্রী গৌরী বর্মন গত ২৭ মার্চ সোমবার রাত ৯-২০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৬১ বৎসর। তিনি দুই সুযোগ্য সন্তান রেখে গেছেন। বড়ছেলে ভেঙ্কটেশ পশ্চিম কোচবিহার জেলা গোসেবা টোলির সদস্য আর ছোটছেলে রাহুল মাথাভাঙা নগর বৌদ্ধিক প্রমুখ। সঙ্ঘচালকের মৃত্যুর পর ও বাড়িতে সঙ্ঘকাজে সবসময় তাঁর আশীর্বাদ ছিল। অতি সাধারণ বেশভূষা ও আন্তরিক আচরণের জন্য সকলের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর অন্তিমযাত্রায় আত্মীয়-স্বজন শুভানুধ্যায়ী-সহ কয়েকশো মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ওঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

রঙ্গুন : গল্প বলার অযোগ্যতায় ঠিক জমল না

অনন্যা চক্রবর্তী

৯০-এর দশকে কলকাতার একটি নামী চলচ্চিত্র শিক্ষাকেন্দ্রের তৎকালীন অধ্যক্ষ বিখ্যাত পরিচালক অসিত সেন প্রায়শই বলতেন, একজন পরিচালকের প্রধান গুণ হলো পর্দায় গল্প বলতে পারা। কারণ সাধারণ দর্শক সিনেমায় গল্প দেখতে এবং শুনতে আসেন। বাংলা হিন্দি এবং ইংরেজি সিনেমার যারা প্রবাদপ্রতিম পরিচালক তারা সকলেই গল্প বলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিক থেকে শুরু করে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়-বাসু চট্টোপাধ্যায়-রাজকাপুর- সুরজ বরজাতিয়া কিংবা বার্গম্যান-ফেলিনি-কুরোসাওয়া— কেউই তার ব্যতিক্রম নন।

এসব পুরনো কথা বলতে হলো তার কারণ সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত একটি হিন্দি ছবি, রঙ্গুন। পরিচালক বিশাল ভরদ্বাজ। অভিনয় করেছেন সইফ আলি খান, কঙ্গনা রানাওয়াত, শহিদ কপুর প্রমুখ। রঙ্গুন নিয়ে লেখার কারণ, রিলিজের আগেই ভারতীয় মিডিয়া ছবিটিকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ৭০ কোটির ছবি এখনও পর্যন্ত ৩০ কোটি বাজার থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছে। সেই হিসেবে ছবিটিকে ফ্লপ বললেও অন্যায় হবে না।

না, ফ্লপহিটের প্যাঁচপয়জারে ছবির নান্দনিকতার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া এই নিবন্ধকারের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সিনেমার নান্দনিকতা বহুলাংশে পরিচালকের গল্প বলার দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। ঠিক এই জায়গায় বিশাল ভরদ্বাজ ব্যর্থ। গল্পের মূল প্লটের সঙ্গে অজস্র সাব-প্লট মেলাতে গিয়ে অনেক জায়গায় তিনি খেই হারিয়েছেন। এর আগে আমরা বিশালের ওমকারা, হায়দর হিমন্ত ইত্যাদি দেখেছি। আমরা জানি ধ্রুপদি ইংরেজি সাহিত্যে (প্রধানত শেক্সপিয়রে) তার একটু দুর্বলতা আছে। ওমকারা তৈরি হয়েছিল ওথেলোর ছায়া অবলম্বনে। আবার হায়দরের প্রেক্ষাপটে রয়েছে হ্যামলেট। সেইসব ছবিতে শেক্সপিয়রের ভারতীয়করণ করতে গিয়ে মূল প্লটের স্বাভাবিকতা বিশাল মোটামুটি বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু রঙ্গুনের ক্ষেত্রে তা হয়নি।

ছবির কাহিনি মোটামুটি এরকম : জুলিয়া (কঙ্গনা রানাওয়াত কৃত) একজন নামকরা অভিনেত্রী। রুসি বিলিমোরিয়া (সইফআলি খান) নামী প্রযোজক-পরিচালক। জুলিয়া এবং রুসি একসঙ্গে থাকে। বিলি নিজেও একসময় অভিনয় করত কিন্তু অ্যাকসিডেন্টের কারণে অভিনয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ছবির তৃতীয় প্রধান চরিত্র হলো জমাদার নবাব মালিক। ইন্দো-বর্মা বর্ডারে সেনাবাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে নবাব মালিকের (শহিদ কপুর) সঙ্গে জুলিয়ার আলাপ হয়। সোনার খাঁচার বন্দিজীবনে হাঁপিয়ে উঠেছিল জুলিয়া। নবাবের সারল্য এবং ছায়াসুনিবিড় প্রেম তাকে চুম্বকের মতো টেনে নিল।

গল্পের পশ্চাৎপট হিসেবে এসেছেন নেতাজী, আজাদ হিন্দ বাহিনী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সম্ভবত পরিচালক যুদ্ধের পটভূমিতে একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্লট-সাবপ্লটের গোলমালে তা হয়নি। অভিনয়ে কঙ্গনা রানাওয়াতকে এগিয়ে রাখতে হবে। বিষাদ তার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। এর আগে গ্যাংস্টার ছবিতেও তা লক্ষ্য করেছিলাম। জুলিয়ার পাওয়া-না পাওয়ার দ্বন্দ্ব তিনি সুচারু রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। শহিদের নবাবও বেশ ভালো। সইফ আলি খান চেষ্টা করেছেন আপ্রাণ। চিত্রনাট্য তাকে সুযোগও দিয়েছিল। কিন্তু সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। অন্তত আমরা ল্যাংড়া ত্যাগিকে (ওমকারা) রুসি বিলিমোরিয়ার থেকে এগিয়ে রাখব। ক্যামেরার কাজ অসাধারণ। আউটডোরের দৃশ্যাবলী দেখে হলিউড বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এত কাট আর মিক্সিং কেন? এতে ছবির বাহ্যিক গতি বাড়তে পারে, ছবি দেখার আনন্দ অনেকাংশে ব্যাহত হয়। ছবির সঙ্গীত মোটামুটি।

শব্দরূপ-৮২৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

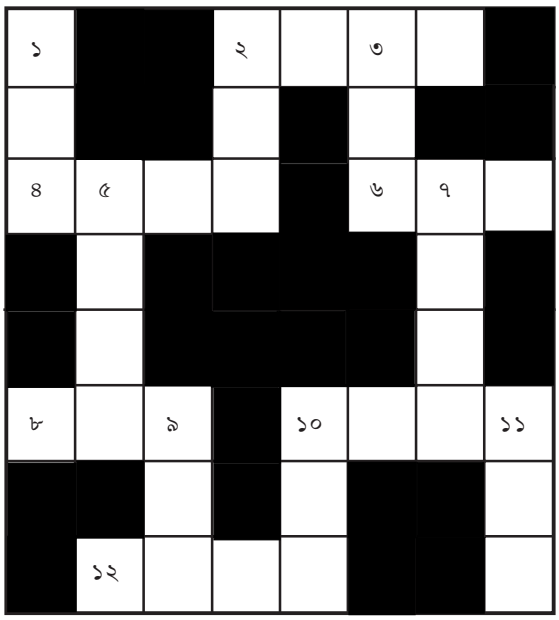

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. সূতিকাগৃহে যে নারী প্রসবকাল হইতে প্রসূতির শিশুকে লালন করে, ৪. আকাশে দৃশ্যমান বহুদূরস্থ নীহারপুঞ্জ সদৃশ বাষ্পীয় পদার্থ বা নক্ষত্রসমষ্টি, ৬. রুদ্রবীণা, ৮. বড় এক প্রকার লেবু, ১০. চন্দ্র, ১২. অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহার্থে সম্প্রদান।

উপর-নীচ : ১. দুর্গা, ২. নলখাগড়া, শরফুলের গাছ, ৩. তৃণধান্য, ৫. নতুন বৎসরের হিসাবের খাতা, ৭. বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, ৯. বিদ্যুৎ, বিজলী, ১০. জনহীন, ১১. সুন্দর পক্ষীবিশিষ্ট পক্ষী, গরুড়।

সমাধান
শব্দরূপ-৮২৩
সঠিক উত্তরদাতা
বংশীদাস রায়
খাতড়া, বাঁকুড়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৮২৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩ এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ২৫

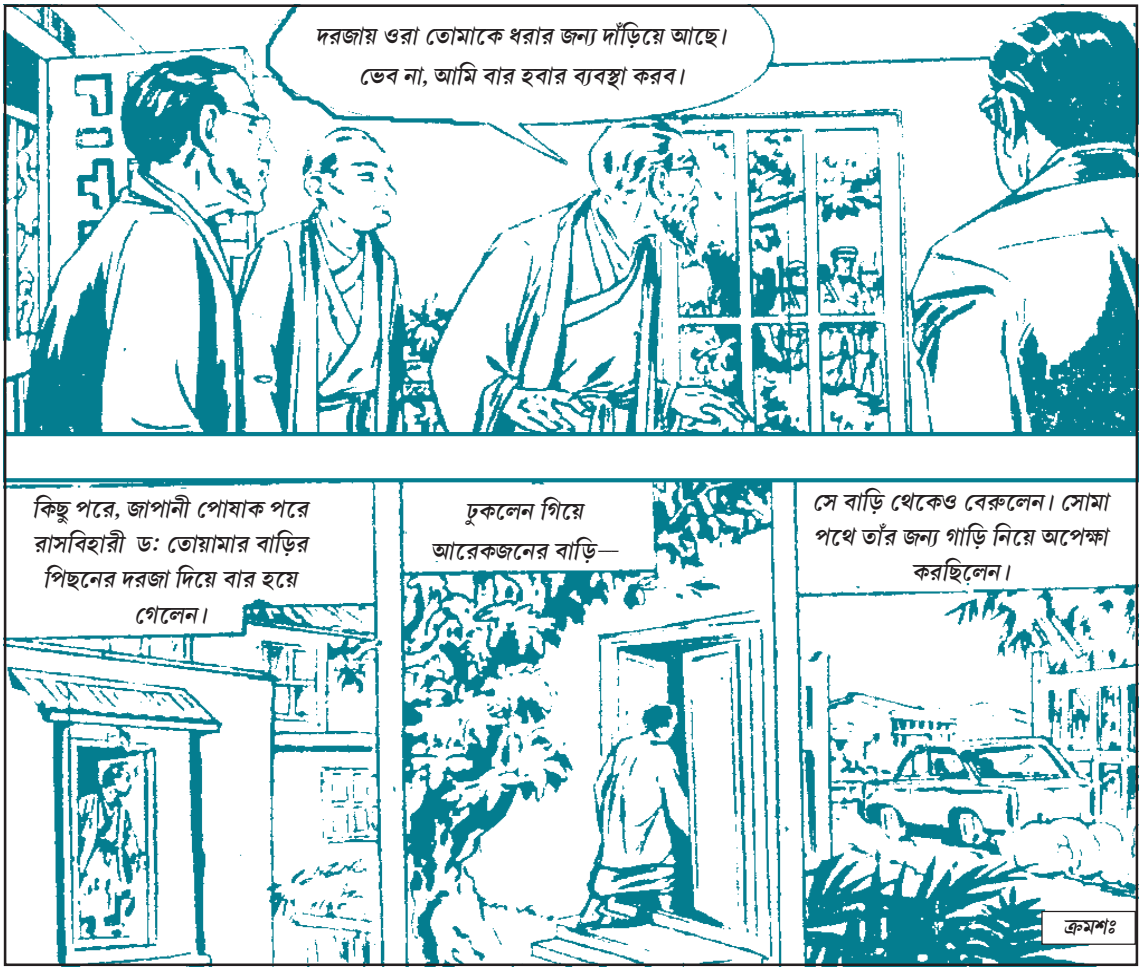

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

২০১৭ : রাষ্ট্ররক্ষা সংকল্প বর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝেমাঝেই দেশদ্রোহিতার স্লোগান ওঠে, এরকম ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে চিহ্নিত করে দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত ফ্রন্ট ফর অ্যাওয়ারনেস অব ন্যাশনাল সিকিউরিটি (ফ্যানস) সচেতনতামূলক পদক্ষেপ করতে চায়। সম্প্রতি ফ্যানসের কার্যকর্তা ইন্দ্রেশকুমার জানিয়েছেন, ২০১৭ সালকে তাঁরা রাষ্ট্ররক্ষা সংকল্প বর্ষ হিসেবে পালন করতে চান। আমাদের উদ্দেশ্য দেশের অন্তত ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারণ ঘটানো।'

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায় আয়োজিত একটি সেমিনারে ফ্যানসের সদস্য শাজিয়া ইলমিকে বক্তব্য পেশ করতে দেওয়া হয়নি। কারণ তিনি তিন তালাকের বিপক্ষে কথা বলতে চেয়েছিলেন।

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. প্রকাশনের স্থান : ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,
২. প্রকাশনের সময় : সাপ্তাহিক। **৩. মুদ্রকের নাম :** শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** পি/২০৩, পশ্চিম পুটিয়ারি কলোনী, সিএমসি-১১৫, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
৪. প্রকাশকের নাম : শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** পি/২০৩, পশ্চিম পুটিয়ারি কলোনী, সিএমসি-১১৫, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
৫. সম্পাদকের নাম : শ্রী বিজয় আঢ্য। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২৭/১, বি, বিধান সরণি, কলকাতা -৬। ৬. **মালিকানা :** স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট।
ঠিকানা : ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬।
ট্রাস্টের সদস্যবৃন্দ :
শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত, ৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা -৬।
শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, ৬৪, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলকাতা - ৬৭।
শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পি/২০৩, পশ্চিম পুটিয়ারি কলোনী, সিএমসি-১১৫, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
শ্রী সত্যনারায়ণ মজুমদার, পুড়াটুলী, মালদা।
শ্রী অরুণ প্রকাশ মল্লাবত, ৯৫বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭৩।
শ্রী দেবাশিস লাহিড়ী, ২/৫, সর্ট রোড, দুর্গাপুর -৪।
শ্রী প্রদীপ কুমার দে, ১০/৩৮, বিজয়গড়, পোঃ যাদবপুর, কলকাতা-৩২।
শ্রী অদ্বৈত চরণ দত্ত, ৯-এ অভেদানন্দ রোড, কলকাতা - ৬।
শ্রী সারদা প্রসাদ পাল, ২০/৩, হালদার বাগান লেন, উল্টাডাঙ্গা, কলকাতা - ৪।
শ্রী মোহনলাল পারিখ, পারিখ অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েট, বি কে মার্কেট, ১৬বি, সেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা -৭০০০৭১
শ্রী তিলকরঞ্জন বেরা, নিউ টাউন, ইন্দা, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিনকোড ৭২১৩০৫।
আমি শ্রী রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর
শ্রীরণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তারিখ ঃ ১৩.০৩.২০১৭

২০৫০-এ ভারতে সর্বাধিক মুসলমান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলমান জনসংখ্যার দেশ হবে ভারত। ২০১০ সালের জনসমীক্ষা বলছে, সারা বিশ্বে মুসলমান জনসংখ্যা ১৬০ কোটি। ২০৫০ সালে তা বেড়ে হবে ২৮০ কোটি। চলতি দশকে যেখানে ৩৫ শতাংশ হারে বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ার কথা, সেখানে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার হতে পারে ৭৩ শতাংশ।

সম্প্রতি মার্কিন রিসার্চ সেন্টার 'পিউ' এই তথ্য প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, এখন ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুসলমান বসবাস করে।

অসমে অবশ্য পাঠ্য সংস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অসমে সর্বানন্দ সোনোয়াল সরকার সংস্কৃতকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্যপাঠ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী সোনোয়াল সংস্কৃতকে 'ভারতের সমস্ত ভাষার জননী' আখ্যা দিয়ে বলেন, 'সংস্কৃত ভাষা শেখার অর্থ নিজেকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

শুধু তাই নয়, এই ভাষা শিখলে একজন ছাত্র নিজের সেই শেকড় খুঁজে পাবে যা তাকে ভারতীয় সভ্যতার গভীরতা বুঝতে সাহায্য করবে।'

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
13 March - 2017 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।